শিশু যিশুর পরিবার ও আমাদের পরিবার

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই পরিবারের উৎপত্তি দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক ভালোবাসার ফল ও স্বর্গীয় আশীর্বাদ হলো সন্তান। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান- সন্ততি ও নিকটতম আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। আর এই পরিবারের কর্তা হন পিতা-মাতা এই পরিবারের কর্তা হন পিতা-মাতা। এই পরিবারেই একে-অন্যকে সাহায্য করে, রক্ষা করে। তাই পরিবার হলো এমনি একটি সংগঠন যেখানে প্রতিটি সদস্য-সদস্যার মধ্যে থাকে অকৃত্রিম মায়া-মমতা, স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। শিশু যিশুর পরিবারকে বলা হয় আদশ পরিবার। মা-মারীয়া, সাধু যোসেফকে ও যিশুকে নিয়ে গঠিত পরিবারকে বলা হয় নাজারেথের পুণ্যতম পরিবার। শিশু যিশুর পরিবারে এমন কি বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী বা মূল্যবোধ ছিল যার জন্য এ পরিবারকে বলা হয় আদশ পরিবার? এবং আমরা যারা যিশুর অনুসারী, খ্রিস্টীয় পরিবার হিসেবে পরিগণিত আমাদের পরিবারগুলো কেমন আছে, কোথায় আমাদের অবস্থান, কি করলে আমাদের পরিবারগুলো আদর্শ পরিবার হিসেবে সুপরিচিত হতে পারে সে বিষয় নিয়ে আমরা অনুধ্যান সহভাগিতা করতে আমরা এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শিশু যিশুর পরিবার ও আমাদের পরিবার : ১. প্রেমময় পিতা ঈশ্বর এ জগতকে এতো ভালোবাসলেন যে, তার একমাত্র পুত্র যিশুকে মানুষরূপে, মানুষের মাঝে, মানব পরিবারে পাঠিয়েছিলেন। সাধু যোসেফ ও ধন্যা কুমারী মারীয়া আদর্শ পিতা-মাতা হয়েছেন, কারণ তারা ঈশ্বরের বাণী, ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে নিজের ইচ্ছা বলে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং ঐশবাণী ও ইচ্ছাকে মানবদেহ দান করে তা বাস্তবে, এই দৃশ্যমান জগতে প্রকাশ করেছেন। তাদের আদর্শ পারিবারিক জীবনের মূল উৎস ও কেন্দ্র ছিল স্বয়ং তাদের আদর্শ সন্তান যিশু : ঈশ্বরের মূর্তবাণী, জগত ও মানুষের মুক্তিদাতা আধুনিক বস্ত্রান্ত্রিক জগতের নানা ভোগ-বিলাসিতা কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ্ধতির ব্যবহার অপকৃষ্টি ও ফ্যাশন আমাদের পরিবার জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ, ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে বুঝতে পারা, তা গ্রহণ, বরণ ও স্বাগত জানানোর সময় আমাদের পরিবারে নেই; চিন্তা-চেতনায়ও স্থান পায় না। ঈশ্বরের স্বপ্ন ও সৃষ্টির কাজকে পূণভাবে অব্যাহত না রেখে নিজেদের স্বার্থপর ইচ্ছাটাকে পূরণ করে চলছে। তাই বর্তমানে আদশ স্বামী-স্ত্রী বা মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে তথা আদর্শ পরিবারের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

(২) শিশু যিশুর পরিবার ছিল সংগ্রহের উৎস ও শিক্ষালয়: যিশু যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেহে-মনে, আত্মায় ঐশজ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারেন, তার জন্যে সাধু যোসেফ ও মা মারীয়া যিশুর সাথে যাত্রা করছেন। যিশু যেন জীবন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন, পিতা ঈশ্বর যে অর্পিত দায়িত্ব যিশুকে দিয়েছেন তা পূরণ করতে তারা যিশুর সহযাত্রী হয়েছেন *(লুক ২: ২২৫২, মথি ২:১৩-১৫)* আমাদের পরিবারগুলোতে মা-বাবা সন্তানদের ধর্মীয় জ্ঞানে-গুণে বেড়ে উঠতে কতটুকু সাহায্য করেন, সঙ্গদান করেন, জীবনসাক্ষ্য বা আদর্শ স্থাপন করেছেন? এ বিষয়টা আমাকে ভাবুক করে তুলেছে। এইতো কিছুদিন আগের ঘটনা উপস্থাপন/দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রার্থী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর সাথে কথা হচ্ছিল। সিস্টারগণ ধর্মক্লাস দিয়ে যাচ্ছেন; ধর্মশিক্ষার বই তার আছে কিন্তু সে অন্তরে গেঁথে রাখতে পারছে না। আমি বললাম, তুমি বাড়িতে মা-বাবার সাথে আরেকটু বুঝে নিও; তোমার মা-বাবা শিক্ষিত তোমাকে ভালো বুঝাতে পারবে। মেয়েটির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল আমার মা-বাবা আমাকে পড়াবে? মাতো টিভি সিরিয়ালভক্ত; বাবা দিনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে মোবাইলে হাই-হ্যালো বলেই সময় পার করে। আমার পাশে সাথে বসে পড়ালেখার সাথীও নেই; কোন সহায়তাও নেই; আমি যা-বুঝি তাই পড়ি। আদর্শ পরিবার গড়তে হলে বাবা-মাকে আত্মোৎসর্গ করতে হয় সন্তানদের সাথে যাত্রা করতে হয়, কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

(৩) শিশু যিশুর পরিবারের মূল্যবোধ আমাদের পরিবারের অবস্থান: আদর্শ পারিবারিক জীবন গঠনের নিমিত্তে যে মূল্যবোধ প্রয়োজন সেসব যিশুর পরিবারে অনুশীলন/চর্চা করা হয়েছে। যেমন: করুণাঘন হৃদয়, শান্তি-প্রীতিপূর্ণ মনোভাব, নম্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সম্মান, বাধ্যতা, কৃতজ্ঞতা, ধর্মময়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বা মিলন। মঙ্গলসমাচার আমরা পাই সাধু যোসেফ ও কুমারী মারীয়ার কমতৎপরতা, বাঁধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখে তাদের স্থিরতা, অবিচলতা, ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্যা উত্তরণের জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, নৈতিক সাহস ও শক্তি নিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। আমরা বর্তমান বিশ্বে বাস করছি এক জটিল সমাজে, যেখানে পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধগুলো যেন এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের ফলে দেখা দিচ্ছে অশান্তি, অমিল, অবিশ্বস্ততা এমনকি বিবাহ-বিচ্ছেদ। স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা, মাদকাসক্তি, স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, অন্যদিকে, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে উপেক্ষা অশ্রদ্ধা বা অন্যায় আচরণ; আবার উভয়পক্ষের পরকীয়া প্রেম আজকাল বেশি দেখা যায়। আমাদের পরিবারে সদস্য-সদস্যা আছে সত্য কিন্তু খ্রিস্টীয় পরিবারের পরিবেশের বড় অভাব; খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ চর্চার অভাব মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্বশীলতা কমে আসছে; যে চেতনা কয়েক বছর আগে সক্রিয় ছিল : আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব করবো পালন দিয়ে গুরুত্ব এ সত্য হারিয়ে যাওয়ার পথে নয় কি?

(৪) প্রার্থনা আদর্শ পরিবারের রক্ষাকবজ : পরিবারের জন্য প্রার্থনা করা, সন্তানের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করা, মঙ্গল কামনা করা পিতা-মাতার পক্ষে আদর্শ পরিবার গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ পরিবারে একটি শিশুর জন্ম সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবন ঈশ্বরের দান, তাকে নিয়ে আনন্দ কর, এ শিশু হয়ে উঠবে পরিবারের সদস্য। শিশুর যিশুর জন্মলগ্নে সাধু যোসেফ ও মা মারীয়ার পরিবারের স্বর্গদূতগণ গান করেছিল; রাখালেরা প্রণাম জানিয়েছিল। পিতা-মাতার কাছ থেকেই শিশুরা বাড়িতে প্রার্থনা করতে শিখে এবং ধীরে-ধীরে পারিবারিক পারস্পরিক প্রার্থনার ফলে পরিবার হয়ে উঠে আদর্শ পরিবার। শিশুরা গির্জায় গিয়ে কিংবা সন্ধ্যায় রোজারীমালা প্রার্থনা করার মধ্যেই প্রার্থনা সীমিত নয়। কাজের মাঝে, যাত্রাপথেও আমরা প্রার্থনা করতে পারি। আমি মাকে দেখেছি, মনন প্রার্থনা করতে, সবজি কাটার সময়, রান্নার সময় ঠোঁট নড়ে কিন্তু মুখে শব্দ নাই। আমার অভিজ্ঞতায় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এ প্রার্থনা খুব শক্তিশালী ছিল। আমি মাকে জিজ্ঞস করি, তুমি বিড়বিড় করে কি বলো? তোমার মাথায় কোন সমস্যা? কষ্ট? মা মৃদু হেসে বললেন, আমি সন্তানদের জন্য, পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি; যিশুকে বলি আমার ছেলে-মেয়েরা যেন নিরাপদে কর্মস্থলে পৌঁছে, ওদের মনে যেন কোন অশুভ বা মন্দ চিন্তা না আসে; অন্যায় কাজ না করে, সবাই যেন সু-স্বাস্থ্যে থাকে। মায়ের এ প্রার্থনা আমার মনে ভীষণভাবে দাগ কেটেছে। এখন যখন মৃত মায়ের জন্য প্রার্থনা করি তখন মায়ের নিকট ও প্রার্থনা করি যেন প্রতিটি পরিবার আদর্শ পরিবার, প্রাথনা মান্দির হয়ে ওঠে ; শিশু যিশু যেন সবার ঘরে জন্ম নেয়। নাজারেথের পুন্যতম পরিবার সকল খ্রিস্টীয় পরিবারের মডেল হয়ে উঠুক, আশীসদানে ধন্য হয়ে উঠুক॥

যিশুর দেহধারণ কৃষ্টি থেকে কৃষ্টিতে পরিপ্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম

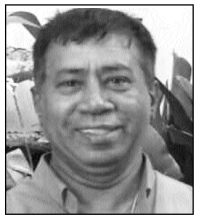

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলা নিয়ে পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আদিবাসীদের বসবাস। বিস্তৃর্ণ পাহাড় জুড়ে বিভিন্ন উপজাতি তাদের নিজস্ব স্বকীয় ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে পাহাড়ভূমিতে একাকার হয়ে মিশে আছে। প্রকৃতি, পরিবেশ তার অনাবিল অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ী জনজীবন বিশাল পাহাড়ে ঝোঁপঝাড়ে খাদ্যসংস্থান ও সংগ্রহের বাসনায় আগুন লাগিয়ে পাহাড়ে জমি প্রস্তুত করে জুম চাষ করে। খাদ্য শস্য উৎপাদন, আদা-হলুদ ও ভুট্টা চাষ করে আদিবাসী পাহাড়ী নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বাঁশ ও ছনের মাচাং ঘর প্রস্তুত করে পাড়াবাসী জীবনধারণ করে। প্রকৃতির মাঝে সৃষ্টিকর্তার অযাচিত দান জীবন-যাপনের মধ্যে আছে গাছপালা, লতাপাতা, পানি ও জলের ঝিরি, ছরা, ঝর্ণা ও নদী। প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রতিবেশি পরিবার নিয়ে সমাজ পরিচালনা সম্পর্ক যোগবন্ধন ও আত্মীয়তা গড়ে উঠে এবং চাষাবাদ হতে ফলন নিয়ে এরা ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান নিয়ে উৎসব পালন করেন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রশংসা, মানত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কৃষ্টির মধ্যে খ্রিস্ট দেহধারণ অপূর্ব কাজ : দূর্গম উঁচু-নিচু পাহাড় অতিক্রম করে খ্রিস্ট প্রেমে অভিষিক্ত মিশনারী ও দেশীয় বাণী প্রচারমুখী যাজকগণ একদা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এলাকায় বাণীপ্রচার করে স্বার্থকভাবে খ্রিস্টবাণী প্রচারে সুফল মা মারীয়ার অশেষ কৃপা অনুগ্রহে কৃষ্টির মধ্যেই খ্রিস্ট যিশুর পরিত্রাণের বাণী দৃশ্যমান করে তুলেছেন। রাঙ্গামাটি বন্ধু যিশু টিলা ও বান্দরবানের ফাতেমা রানী গির্জা প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ধারাবাহিকতা বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা প্রেরিতশিষ্য যোহনের গির্জাসহ চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের সাতটি ধর্মপল্লী খ্রিস্টের দেহধারণের কঠিন ও সুমহান কাজ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। বিপুল সম্ভবনাময় বাণীপ্রচারে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত ও গতিসঞ্চার অব্যহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিষিক্ত যাজকগণ, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের নিরলস বাণীপ্রচারের আনন্দ, কৃষ্টিগত উপাসনা, প্রার্থনা, গান ও পার্বণ উৎসবমুখর হয়ে পালিত হচ্ছে। বাণীপ্রচারের মিষ্টি স্বাদ ও সুমিষ্ট গন্ধ এবং ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টির নাচ-গানে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত উপাসনার আকর্ষণ সবাইকে চমৎকারভাবে খ্রিস্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করছে এবং নতুন উদ্ভাবনী শক্তি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় আলোকিত মণ্ডলী গড়ে ওঠেছে। খ্রিস্টের দেহ ধারণ ও মণ্ডলী বিস্তার কাজে এখানে স্কুল, হোস্টেল, ডিসপেনসারী, সেমিনারী, পালকীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সৃজনশীল ও মানসম্মতভাবে কৃষ্টি ঐতিহ্যধারাকে অক্ষুন্ন রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে ও নতুন-নতুন এলাকায় পথ পরিক্রমণের আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ বিস্তার লাভ করছে।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পরিচালিত সংস্থা কারিতাস পাহাড়ী কৃষ্টিতে শান্তি, ন্যায্যতা, সম্প্রীতি ও সংলাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাহস, প্রত্যয় ও দারিদ্র্য বিমোচন অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানবাধিকার ও মানব উন্নয়নের জন্যই ধর্মপল্লীর সাথে যোগাযোগ, ত্যাগ ও সেবাকাজ আন্তরিকভাবে করে যাচ্ছে। আদিবাসী খ্রিস্টভক্ত বিশ্বাসীদের বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহারে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, কৃষিকাজে লাভজনক প্রক্রিয়ার নতুন কর্মক্রিয়া, সমবায় ও সঞ্চয়ী নতুন ধারা সৃষ্টি, পানিবাহিত ও মশার কামড়ে সৃষ্ট রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ ও সুস্থ থাকার প্রক্রিয়া ও প্রেষণা দান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কারিতাস সংস্থার ভূমিকা অবদান ও চলমান কার্যক্রম অবিস্মরণীয়।

পাহাড়ী কৃষ্টি থেকে কৃষ্টিতে খ্রিস্ট দেহধারণের স্বপ্ন, দুরদৃষ্টি ও প্রচারকাজে মঙ্গল চিন্তা-চেতনা নিয়ে সীমিত পরিসরে আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করছি। পাহাড়ীদের প্রতি তীব্র ভালোবাসা, মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ পালকবিহীন মেষের কাছে যাওয়ার পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার ও খ্রিস্টীয় আধ্যাতিকতা নিয়ে নতুন এলাকা সন্ধানের ও আহ্বানের প্রতি সবিনয়ে শ্রদ্ধা রেখে বৃহত্তর পার্বত্য এলাকার ভিতরে ষাট- এর দশকে ফাদার বার্টি রড্রিগস, ফাদার শিমন থেটা, ফাদার এমবু, ফাদার সিলভিও জ্যাঁ ও অবসরে আসা বিশপ রেমন্ড লারোস পাহাড়ী কৃষ্টিতে সংযোজিত হয়ে রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরা, অহমিয়া, গুর্কা, চাকমা, বম, পাঙখুয়া এবং লুসাইদের সাথে মিলে-মিশে জীবন-যাপন, দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী ও সমসাথী হয়ে সেবাকাজ, এলাকা প্রদক্ষিণ, পরিদর্শন ও পরিবর্তনধর্মী সেবাকাজ করে এলাকায় খ্রিস্টধর্মের আলোকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে দীক্ষা ও প্রেরণকাজে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ হতে পরবর্তী বছরে কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্ট কৃত্রিম জলপ্লাবনের ফলে পাহাড়ী জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আশ্রয় অনিশ্চয়তা ও দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে জীবনের ছন্দপতন হলো। পাহাড়ীদের দৈন্যদশা ও ক্রান্তিলগ্নে বিশপ রেমন্ড লারোস উজ্জ্বল উদিত তারকার মতো পাহাড়ীদের জীবন রক্ষা ও পুনরুদ্ধার কাজ করেছেন। এই মহাদূর্যোগকালে ফিলিপ ত্রিপুরাকে সেবাকাজে নিয়োজিত করে কোর থেকে প্রাপ্ত হুমানা টিনের গুড়া দুধ, টিন ফুড, আটা এবং বস্ত্র বিতরণ করে পাহাড়ীদের দুসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক তারে

বিদ্যুৎ প্রবাহের অন্তরালে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ী জনগণের দীর্ঘশ্বাস আজ ও কাপ্তাই বিদ্যুৎকেন্দ্রের তারে প্রবাহিত হচ্ছে। পাহাড়ীদের জীবনে বড় ধরনের দুঃখ-কষ্ট সীমাহীন দুর্ভোগের ইতিহাস ও পরিধি খুব ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দূর্ভিক্ষ ও পাহাড়ী শান্তিবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সাথে অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে সংঘর্ষে মৃত্যুপুরী সৃষ্টি হলে, তখন এ মিশনারী ফাদারগণ যথেষ্ট সাহায্য করেন। জার্মান নাগরিক মি: সুইলার ঔষধ কোম্পানীর কাজের সুবাদে শাপনালা এলাকায় ৫ একর জমিতে রেস্ট হাউস নির্মাণ করলে কানাডিয়ান মিশনারী ফাদারগণ ও ব্রাদারগণ রাঙ্গামাটিতে এসে শাপনালায় ধ্যান প্রার্থনায় ও নির্জনে সময় অতিবাহিত করতেন। এ সময় স্থানান্তরিত হওয়া খ্রিস্টভক্তদের পুনরুদ্ধার করতে রাঙ্গাপানি, কলেজ গেইট, টিএন্ডটি ও দেবাশীষ নগরে নতুন করে বাণীপ্রচার করেছিলেন। এখানে পরবর্তীকালে ফাদার সেন্ট পিয়ার কাথলিক চার্চকে বন্ধু যিশু টিলা নাম দিয়ে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী ১৯৮৫-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপযুক্ত নিরাপত্তাজনিত পরিবেশ না থাকার কারণে রাঙ্গামাটিতে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক ছিল না। এরপর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি পাল - পুরোহিতের দায়িত্ব পেয়ে আবার হারানো মেষ পুনরুদ্ধার করতে নিরলস পালকীয় কাজ ও বাণীপ্রচার কাজে মনোনিবেশ করে সেবাকাজে ব্রতী হন। ফাদার এলিয়াস পালমা এই সময়ে মি: যোসেফ বিগেল ও বাপরু মারমা এদের সহযোগে প্যারিশ পরিচালনা ও ছেলে হোস্টেল পরিচালনার কাজ করতেন। তখন দেবাশীষ নগর, গর্জনতলী ও বালুখালীসহ রাঙ্গামাটিতে সেবাকাজ করতেন। ফাদার এলিয়াস খাগড়াছড়ির জিরো মাইলের কাথলিক মিশনের জায়গা নিজেদের আয়ত্বে আনার কঠিন কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তিনি জিরো মাইলের সেনাবাহিনী ক্যাম্পের পাশে মিশনের অবশিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে তখন মি: মঞ্জু লক্ষ ত্রিপুরাকে সঙ্গে নিয়ে পানছড়ির কানেনগো সাঁওতালপাড়া, লতিবান চাকমা পাড়া ও ত্রিপুরাপাড়া এলাকায় খাগড়াছড়ি প্রান্তসীমায় বাণীপ্রচার করেছিলেন। তখন সাধ্বী মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের মিশনারী অব চ্যারিটি সিস্টার ইলেন ও সিস্টার শিবনসহ আরো অনেকে রোগীসেবা, ঔষধ বিতরণ, খাদ্য বস্ত্র সাহায্যসহ সেবাধর্মী কাজ এলাকায় করেছিলেন তা এখনো অব্যাহত আছে। খাগড়াছড়িতে নতুন মিশন যাত্রা ও ধর্মপল্লী গঠনের দ্বারপ্রান্তে এসে হলি ক্রশ সিস্টারদের প্রস্তুতি কাজ চূড়ান্তভাবে সুসম্পন্ন হয়। পরম স্রষ্টার আশীর্বাদে ২৪ মে, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পরম শ্রদ্ধেয় কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও চট্টগ্রামের বিশপ থাকাকালীন খাগড়াছড়িকে নতুন ধর্মপল্লীতে উত্তীর্ণ ও প্রতিষ্ঠা করেন।

খাগড়াছড়িতে আন্তমাণ্ডলীক প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশ শাসন আমলে কমলছড়ি খ্রিস্টান বেতছড়ি চাকমা এলাকায় বাণীপ্রচারে বীজ রোপিত হলো। পরবর্তীতে ১৯৯০ দশকে আমেরিকান মিশনারী আর টি বার্কলী ফেনী জেলায় ব্যাপ্টিস্ট ফেলোশীপ চার্চ হতে তুষার বিশ্বাস ও বিজন বিশ্বাসকে পালকীয় দায়িত্ব দিয়ে বাণীপ্রচার ও অবগাহন করে চার্চ গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। এসময়ে এরা দুইজন চাকমা এলাকায় বাণীপ্রচার করে সুদীপ্ত চাকমাসহ আরো অনেককে অবগাহন দিয়ে কয়েকজনকে বাইবেল প্রশিক্ষণ করিয়ে এনে পালকের দায়িত্ব দিলেন। অপরদিকে, কীরণ রোয়াজাকে ত্রিপুরা জাতির মধ্যে খ্রিস্টীয় সমাজমণ্ডলী গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এ অর্পিত দায়িত্ব তিনি তখন সবার মধ্যে ভাগ করে নিলেন এবং মহালছরা পানিতে অনেককেই অবগাহন করে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলেন। এ সময়ে রণবিক্রম ত্রিপুরা, নন্দকিশোর ত্রিপুরা ও মৃনাল কান্তি ত্রিপুরা মহালছরায় পানিতে অবগাহন নিয়ে খ্রিস্ট সমাজের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন। খাগড়াছড়ির চেঙ্গী নদীর পাশে চেলাছড়া ত্রিপুরা পাড়া, বাঙ্গালঘাতী, বেলতলী, ঠাকুরছড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বাণীপ্রচার করেছিলেন। ব্যাপ্টিস্ট ফেলোশীপ ইভানজালাইজেশন কাজে আর টি বার্কলী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সাহায্য সহানুভূতির কাজ করেছিলেন। পাহাড়ী সমাজের পুজি বিনিয়োগ, হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, শুকর প্রতিপালন, চাষাবাদ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবায় তার সুদৃষ্টি ছিল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আদর্শ কাজ। আর টি বার্কলী স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরবর্তীকালে এ খাগড়াছড়িতে বিলিভার চার্চ (গসপেল ফর এশিয়া), প্যান্টিকষ্টাল চার্চ, প্রেসবিটারিয়ান চার্চ, নবপ্রেরিতিক চার্চ, এস ডি এ চার্চ, চার্চ অব ক্রাইষ্ট, চার্চ অব বাংলাদেশ ও পরিচর্যা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ খাগড়াছড়ি বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বাণীপ্রচার, মণ্ডলী স্থাপন ও বিশ্বাসীদের নিয়ে স্থানীয় পালকের নেতৃত্বে বিশ্বাসের জীবন-যাপন করছেন। স্থানীয় পালকদের গঠন প্রশিক্ষণের রাজেন্দ্রপুর প্রার্থনা কুঞ্জ, গাজীপুর ডিসি সেন্টার, মিরপুর, ঢাকা কৈনিয়া সেন্টার ও বাঁশখালী দিশারী সেন্টারে প্রশিক্ষণ দিয়ে পালকের দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। কাথলিক চার্চ থেকে ২০০৯-২০১০ খ্রিস্টাব্দ কয়েকজনকে যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। প্রতিটি চার্চ বড়দিন উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে ১০,০০০/- হতে ২০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পেয়ে বড়দিনের মিলনভোজ বিশ্বাসীদের থেকে সংগ্রহ করা চাল, শুকরের মাংস ও তরিতরকারী দিয়ে নিমন্ত্রিত অতিথি, পাড়া-প্রতিবেশি, মাতাব্বর, পাড়া কার্বারী, মুরুব্বী ও স্থানীয় মেম্বার চেয়ারম্যান নিয়ে বড়দিন উদ্‌যাপন করা হয়।

কাথলিক মণ্ডলীর কাথলিক মণ্ডলীর সেবা কার্যক্রম মূলত মফস্বলভিত্তিক পালকীয় সেবাকাজ। বর্তমানে কাথলিক মণ্ডলীর সুনির্দিষ্ট পালকীয় পরিকল্পনায় খ্রিস্টেতে আমার আত্মপরিচয়ে সদ্য প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তার পালকীয়পত্রের নির্দেশনায় ভক্তদের মাঝে পালকীয় কাজ নিরুপিত ও আরোপিত হচ্ছে। কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাসযোগ্যতা, খ্রিস্টীয় উপাসনা, খ্রিস্টযাগ, মা মারীয়ার রোজারীমালা প্রার্থনা ও সাক্রামেন্তিয় সেবাকাজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৪টা পাড়াতে কাথলিক মণ্ডলীর উপস্থিতি অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হয়ে সুন্দর ও সক্রিয়ভাবে বিশ্বাসের জীবন ভক্তিভরে জীবন-যাপন করছে। সকল আদিবাসী খ্রিস্টভক্ত তাদের ঐতিহ্যবাহী আপ্যায়ন, আতিথেয়তা ও উপাসনায় ফসলের নতুন ফলন উৎসর্গ করে নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানে যাজককে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ত্রাণকর্তা যিশুকে মুক্তির পথ হিসেবে আপন করে নিচ্ছে। বর্তমান চলতি বছরে বৈশ্বিক করোনাকালের বিপদ সঙ্কটে এরা সহৃদয় হয়ে তাদের ঘরের খাদ্য-শস্য তরিতরকারী পাঠিয়ে ফাদার সিস্টারদের সহযোগিতা করছে। স্থানীয়দেরকে যিশুর ভালোবাসা বুঝতে সহায়তা করে যাচ্ছেন মিশনের কর্মরত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ ত্যাগ ও ভালোবাসার কাজের মাধ্যমে। খ্রিস্টের দেহগ্রহণ ও খ্রিস্টের দেহরূপ মণ্ডলী আরো সম্প্রসারিত, প্রস্ফুটিত ও টেকসই বিশ্বাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। সবাইকে বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই॥

বড়দিন : এক আনন্দময় অনুষ্ঠান ও আনন্দমুখর দিন

কামনা কস্তা

ঋতুবদলের পালাচক্রে প্রকৃতিতে হেমন্তের ঋতুর পরেই শীতের আগমন। হেমন্তে বাংলার অবারিত মাঠ জুড়ে থাকে সোনালি ধানের মৌ-মৌ গন্ধ। কৃষাণ-কৃষাণী ব্যস্ত নতুন ফসল ঘরে তোলার কাজে। নতুন ফসল ঘরে উঠার পর নবান্ন উৎসবও পালন করা হয়। এ সময়ে কুয়াশার আবরণে শীতের চাঁদর মুড়ি দিয়ে পৌষ আসে এক মহাআগমনী বার্তা নিয়ে; সেই বার্তা হল মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি তথা শুভ বড়দিনের আগমনবার্তা। নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে মাতোয়ারা কৃষকের আনন্দের পালকে যুক্ত হয় মহা আনন্দ। ফুলে ফুলে ভরে ওঠা প্রকৃতি স্বাগত জানায় জগতের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টকে। খ্রিস্টভক্তজনমনে বড়দিন তাই এক মহা আনন্দের অনুষ্ঠান।

২৫ ডিসেম্বর ছোট্ট শিশু যিশুর জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবের সূচনা হয় মূলত আগমনকালের শুরু থেকেই। মুক্তিদাতার আগমনীকে কেন্দ্র করে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রস্তুতিতে সরব থাকে খ্রিস্টভক্তগণ। বাহ্যিক প্রস্তুতিস্বরূপ ঘর-দোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, লেপা-মোছা করা, বাড়ির উঠান জুড়ে বাহারি সব আল্পনা করা, ঘরের দেয়ালে বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে আঁকি-বুকি করা, ঘর-দোর রঙিন কাগজে সাজানো, গোশালা নির্মাণ করা, রঙিন বাতি লাগানো এবং আরও কতো কি! তাছাড়া বড়দিনে নতুন পোশাকের আলাদা আবেদন থাকে। এইসময়ে ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন পোশাক-আশাক কিনে দিতে প্রতিটি বাবা-মা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। স্বামী ও তার স্ত্রীকে কাপড় উপহার দেন আর কর্মক্ষম নারীরাও স্বামীর জন্য বিশেষ কিছু-কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেন। গৃহিনীরা স্বামী ও ছেলেমেয়েদের প্রিয় খাবার-দাবার প্রস্তুত করে বড়দিনের আয়োজনকে আরও পূর্ণতর করে তোলেন। অন্যদিকে, ছেলে-মেয়েরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বড়দিনের কার্ড ও উপহার প্রদান করে থাকে, অন্যধর্মের বন্ধুদেরও দাওয়াত করে বড়দিনের আনন্দ সহভাগিতা করে। এমন আরো অনেক আয়োজন চলে এই বড়দিনকে ঘিরে!

একইভাবে যিশু খ্রিস্টকে নিজেদের হৃদয় গোশালায় স্থান দিতে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিও চলে সমানভাবে। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে গির্জায় এবং বাড়িতে প্রতিদিন প্রার্থনা করা হয়। অনেকে বাড়িতে আগমনচক্র স্থাপন করে প্রতিদিন প্রার্থনা করে। পাশাপাশি, প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা, আগমনকালীন বিশেষ সেমিনার, অনুধ্যান, প্রার্থনা, পাপস্বীকার প্রভৃতির মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তগণ নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করেন। এভাবে সকলে মুক্তিদাতার আগমনের পথ প্রস্তুত করেন। দুই হাজার বছর পূর্বে যিশু খ্রিস্ট যে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় ক্ষুদ্র গোশালায় জন্ম নিয়েছিলেন, এখন তিনি তেমন গোশালায় আর জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি এখন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের হৃদয় গোশালায়। তাই প্রতিটি হৃদয়কেই তো প্রস্তুত করতে হয়, নয়তো প্রভু যিশু আমাদের হৃদয় গোশালায় জন্ম নিবেন কী করে? তাই এ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির মধ্যদিয়ে সকলে যিশুর আগমনের পথ সুগম করে তোলে, আর এভাবেই বড়দিনের আনন্দ পরিপূর্ণতা পায়।

বড়দিনকে ঘিরে আরেকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বড়দিনের আনন্দোৎসবে পরিবারের সাথে একাত্ম হতে চাকুরীরত পরিবারের কাছের মানুষেরা নাড়ীর টানে শিকড়ের কাছে ছুটে আসে। আবার যারা যৌথ পরিবারে বাস করে, তারাও পরিবারসহ শহর থেকে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। তখন বহুদিন পর কারও বাবা-মা, কাকা-কাকী, কাকাতো-জ্যাঠাতো ভাইবোন ও আত্মায়-স্বজনদের সাথে দেখা হয়। তারা একে অন্যকে কাছে পায়। রক্তের বন্ধন আবার নতুন করে যেন জেগে ওঠে! পাশাপাশি, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সকলের দেখা হয়, সুখ-দুঃখের আলাপ হয়। এভাবে পরিবারের সবাই যখন এক সাথে হয় তখন বাড়িতে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাড়িতে বানানো হয় নানা রকমের পিঠা-পুলি। নতুন জামা কাপড় পরে সেজে-গুজে সবাই একসাথে বড়দিনের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে এবং সবার সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা ও আনন্দ সহভাগিতা করে বড়দিনের মাহাত্ম্যকে আরও নিরেটভাবে ফুটিয়ে তোলে। এভাবে পরিবার, গ্রাম, ধর্মপল্লী মিলে একটি মিলন উৎসবে পরিণত হয় বড়দিন; হয়ে উঠে একটি মহোৎসবের দিন।

বড়দিনের আনন্দের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় কীর্তন করার মাধ্যমে। বড়দিনের দিন ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী মিলে কীর্তন করে প্রভু যিশুর জন্মতিথীর সংবাদ বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেয়। অনেক মিশনে কীর্তন প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন গ্রাম নিজেদের সৃজনশীলতা, পোশাক-আশাক, তাল-লয় প্রভৃতি সহযোগে কীর্তনে নতুন মাত্রা যোগ করে। কীর্তন একটি অনন্য শিল্পে পরিণত হয়। কোন কোন অঞ্চলে বড়দিনের পর থেকে পুরো সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন যুব সংগঠন ও দলপাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কীর্তণ করে থাকে। এভাবে খ্রিস্টের আগমন সংবাদ অখ্রিস্টানদের কাছেও পৌঁছে যায়।

বড়দিনের আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা সহভাগিতা হয়। বড়দিনের দিন থেকে পরবর্তী আটদিন খ্রিস্টভক্তগণ বিভিন্ন গ্রামের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের বাড়িতে বেড়াতে যান, তাদের নিমন্ত্রণ করেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। অন্যদিকে, অনেক খ্রিস্টভক্ত বড়দিনের সময় গরীব-দুঃখী ও অভাবী মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। কেউ কাপড়-চোপড় দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে আবার কেউবা বিভিন্ন উপহার দিয়ে। অনেক এলাকার অখ্রিস্টান গরীব মানুষেরাও তাই বড়দিনের অপেক্ষায় থাকেন; কারণ বড়দিনের সময় তারা নতুন কাপড় উপহার পান। এভাবেই তো বড়দিন সর্বজনীন হয়ে উঠে সবার মুখে হাসি ফোটায়!

বড়দিনের প্রকৃত আনন্দ আসে হৃদয় থেকে। প্রতিবেশি ভাই-মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে আমাদের সব আয়োজন ও সমারোহই যেন অমিষ্ট হয়ে ওঠে। তাই যখন আমরা প্রতিবেশি সাথে মনোমালিন্য এবং ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব ভুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলিত হই, অসহায় কোন ভাইবোনের মুখে হাসি ফোঁটাই তখনই মূলত পরিপূর্ণ হয় বড়দিনের আনন্দ। শুভদিনের শুভ চিন্তা, নতুন আশার আলোকরেখা আমাদের হৃদয়ে উথলে ওঠে। এভাবেই বড়দিনের আনন্দের ঢেউ অনবরত আছড়ে পড়তে থাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন সৈকতে॥

বাংলাদেশে খ্রিস্টান কীর্তনগাথার ইতিকথা: বিশ্বের Christmas Carol এর ইতিবৃত্ত ও 'Silent Night'.

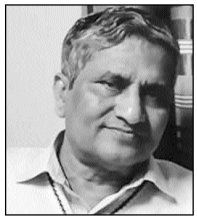

ডা: নেভেল ডি'রোজারিও

আগমনকালের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনপদে দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খ্রিস্টের জন্মতিথি নিয়ে যায় খ্রিস্টান কীর্তন ঢল। বাংলাদেশে বড়দিন উদ্‌যাপনে এ ভজন-কীর্তন এক বিরাট ভূমিকা রাখে। গ্রামে বা শহরে বাংলাদেশের যেখানেই খ্রিস্টান বসতি আছে, বড়দিনের কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন ক্লাব, সংঘ-সমিতি, পাড়া-মহল্লার কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতিরা দলবেঁধে বেরিয়ে পড়ে নেচে-গেয়ে প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারের দ্বারে-দ্বারে বড়দিন আবাহনীর আবহ আনয়নে ভূমিকা রাখে।

হাজার বছর আগের চর্যাপদ বা চর্যগীতিকার পদগুলো বাংলা কবিতা-বাংলা গানের আদিরূপ। চর্যপদগুলো বৌদ্ধসহ জীয়াদের প্রণীত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এক প্রকারের গান। বিভিন্ন পণ্ডিত এবং গবেষকদের মাঝে এর রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও এগুলোর ভাষা যে প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাকাল থেকে বর্তমান বাংলা ভাষার-এ হাজার বছরের পথযাত্রায় অসংখ্য মহৎ গীতিকার এবং কবি নতুন ভাষায় নতুন নান্দনিকতায় বাংলাকে হৃদ্য করেছেন।

একক বা সমবেত ভক্তিমূলক গান বা প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে ভজনের শুরু। ভজন হল দেব তাদের প্রতি ভক্তিমূলক গান। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ (হিন্দু) তাদের দেবতাদের প্রতি ভক্তির নিদর্শন হিসেবে শুরু করেন ভজন। উপাসনালয়ে বিনাযন্ত্রে বা যন্ত্রসহকারে গীত-ভজনের মন ভোলানো ভাষা, ভক্তের মনকে দেয় দুলিয়ে। উজ্জল রসের মঙ্গলগীত ও ধ্বনি, চপল মন ভোলানো ভাষার বোঝা না বোঝার মেশানো ধ্বনিত রঙ্গরহস্যের ধারাপথে সাধারণ ভক্তকূলের মনকে দুলিয়ে দেয়। ভজন কেবলই ধ্বনিসার, কেবলই অর্থহীন গান নয় বরং মগ্ন ভক্তকূলের মনকে তলিয়ে নিয়ে ধাপিত করে অন্তরকে অনুভব করার মানবতাকে ভালবাসার।

বাংলার আদিযুগে পারস্পরিক মৌখিক বচনই ছিল জনগণের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। দশম এবং একাদশ শতকে লিখিত আকারে চর্যাপদের পরে বাংলা ভাষায় নতুন ধারার বাচনভঙ্গী নিয়ে পদাবলী আসে বাংলা সাহিত্যে চন্ডীদাশের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য'। একে-একে আসে 'বিদ্যাপদী পদাবলী, চন্ডীদাশের পদাবলী 'রাধাকৃষ্ণ', বাংলাদেশের মঙ্গল-কাব্য, 'মঙ্গলকাব্য', আরও পরবর্তীতে 'বৈষ্ণব পদাবলী' (songs of Benediction) নামাবলী হল হিন্দু পুরাণের কোন-কোন দেব-দেবতার নাম যপে গানে-গানে তা পরিবেশন করা।

ভজন এবং পদাবলীর সংমিশ্রণে সংকীর্তন যা পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় হয়েছে বর্তমানের কীর্তন। বিশেষভাবে, লক্ষ্যণীয় যে কীর্তনের শুরুটা হয় ভজন-গীতির সুর অনুসরণ করে, যা পরে উৎসবমুখর সুর ও তালে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়াম, খোল, মন্দিরা ও বাঁশি।

পাকিস্তান আমলে বড়দিনটা চিহ্নিত করে ফেলেছিল নগরকেন্দ্রিক ও বিদেশী স্টাইলের। কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির বড়দিন উদ্‌যাপন ছিল ভিন্নতর। টেলিভিশন/রেডিও'র বড়দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানটিতে একটা ভিন্নমাত্রা আন্ত-মাণ্ডলিকভাবে আনয়নের জন্যে রেভা স্মীথ অধিকারীও সুহৃদ জর্জ ডি'রোজারিও লিখলেন স্ক্রীপ্ট। গ্রামবাংলার খ্রিস্টানদের বড়দিন উদ্‌যাপনের পুরো চিত্র চলে আসে অনুষ্ঠানে। সে অনুষ্ঠানের জন্য কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী কীর্তনের ঢংয়ে সুহৃদ কমল রড্রিক্স সুরোপিত গানটি রচনা করেন "আজ ফুলে-ফুলে যায় দুলে-দুলে, সোনালী রোদের আলো"।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমনে বাংলায় খ্রিস্টধর্মের পত্তন হয়। খ্রিস্টধর্ম এদেশের মাটিতে প্রোথিত হবার পরে নদীয়া, কৃষ্ণনগরসহ অনেক খ্রিস্টীয় জনপদে প্রচুর খ্রিস্টীয় কীর্তন শোনা যায়। কারণ যখন বিদেশী সাহেবরা এদেশে এসেছেন, মিশনারীগণ যখন এদেশে এসেছেন সঙ্গে এনেছিলেন ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন। নদীয়া, কৃষ্ণনগর এবং এ বাংলার আনাচে-কানাচের মানুষের রক্তের মধ্যে কীর্তনটা রয়ে গেল। তাই রক্তধারায় বাহিত সে কীর্তনের সুর ও লয় প্রতিনিয়ত তাকে তাড়িত করেছে ভক্তকে সঙ্গীতের উৎসপানে। আরাকান মগজলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত এবং পরবর্তিতে অগাষ্টিনিয়ান মিশনারী সম্প্রদায় কর্তৃক ক্রয়কৃত ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তনী মন পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ভাওয়াল অঞ্চলে হিন্দুদের মাঝে খ্রিস্টবাণী প্রচার শুরু করেন।

দোম আন্তোনিও'র ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি ছিল, জপমালা প্রার্থনা শেষে দোম আন্তোনি রচিত বাংলা ধর্মীয় গান সমবেতভাবে গাওয়ার পরই শুরু হতো ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা। বাঙালি হিন্দুর কাছে খ্রিস্টবাণীর মাহাত্ম হৃদয়গ্রাহী ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণযোগ্য করাতে, বাংলা ভাষায় খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব ও যিশুর বাণীগুলো বুঝাতে, ধরে রাখতে ও প্রচার করতে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে দোম আন্তোনিও ভাওয়ালে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যপুস্তক' ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। একজন পাদ্রি এবং একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক ও বিচার ছিল সে বইয়ের বিষয়। বইটি ঠিক আজকের বাংলা ভাষার স্টাইলের বাংলায় লেখা ছিল না। সাধু ভাষায়তো বটেই, উপরন্তু সে ভাষার সঙ্গে ভাওয়ালের আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণও ছিল তাতে। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে দোম আন্তোনিও'র লেখা বইটিকে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম গদ্য-পুস্তক স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কালক্রমে এসব অঞ্চলে হিন্দুধর্মের ভজন, পদাবলী, সংকীর্তন এর আদলে একই ধরণের সুর অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে যিশুর জন্মতিথি ও তাঁরই কর্মযজ্ঞ নিয়ে রচিত হয়েছে খ্রিস্টান কীর্তনের বিভিন্ন গান। এর সাথে সমান্বিত হয়েছে কবি গান, পালা-গান, বৈঠকী-গান, মরমীগান। এসকল উপাদানকে সম্পৃক্ত করে রচিত হয়েছে সাধু আন্তনীর, সাধ্বী আগ্নেশের পালা যা বহু বছর ধরে পরিবেশিত হচ্ছে এ অঞ্চলে।

বাংলার বাইরে বিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই, যিশুর জন্মতিথি উৎসব পালাগান জনপ্রিয় হ'বার পূর্বে সরকারীভাবে স্বীকৃত ও 'Waits' নামে দলভুক্ত পরিচিত গায়ক দল একাজেনি যুক্ত ছিল। স্থানীয় প্রভাবশালীদের নেতৃত্বে এ দল গঠিত হতো এবং একমাত্র তারাই জনগণের নিকট থেকে এ ব্যাপারে শহর বা গ্রামবাসীর কাছ থেকে চাঁদা বা দান সংগ্রহ করতে পারতো। স্বীকৃত এ দলভুক্ত গায়কদল নৈশ-প্রহরী বা অপেক্ষামান প্রহর গণণাকারী হিসেবে পরিচিত ছিল। এসময়ে জনগণের আগ্রহ এবং এর জনপ্রিয়তার কারণেও সময়ের গণদাবীতে বড়দিনের গান আবার নতুনরূপে ফিরে আসে। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংগীতদল গড়ে উঠে তাদের নতুন-নতুন গান নিয়ে। একারণে সংগীতদল ও বড়দিনের গানগুলো সর্বত্রই হয়ে উঠে আরও জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে Christmas Carol হিসেবে চলে আসে মোমবাতি প্রজ্বলিত সংগীত পরিবেশনা বা Candle lightservices'-এ সংগীত পরিবেশনাকালীন সময়ে পুরো অন্ধকারাচ্ছন্ন গির্জা শুধুমাত্র মোমবাতি আলোজ্বলিত আলোতে উজ্জ্বল করে বড়দিন নিশি-যাপনের এক মোহনীয় পরিবেশ গড়ে তুলে সৃজন করা হয় বড়দিন-বড়দিন ভাব। সারাবিশ্বের প্রায় সব গির্জায়ই এধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের আনন্দ-উল্লাস-ফুর্তি উদ্‌যাপনে কেম্ব্রীজ কলেজ কতৃর্পক্ষ প্রথমবারের মতো এ ধরণের সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় রচিত কিংবা অনুদিত গীত লক্ষাধিক Christmas Carol এর মাঝে চিরঅম্লান-আবেগময় হয়ে আছে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'The Silent Night' গানটি। এ গানের পংক্তিমালার গীতিকার ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মারিয়াপফার শহরের এক পাদ্রী ফাদার যোসেফ মোহর। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা এ গানটিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্কুল শিক্ষকবন্ধু ফ্রাংক জেভারগ্রুভার সুর করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, অষ্ট্রিয়ার ওভেনড্রূপ শহরের সাধু নিকোলাসের গির্জার ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনের প্রাক্কালে বড়দিন উদ্‌যাপন প্রস্তুতিকালে ফাদার যোসেফ মোহর তার স্কুল শিক্ষকবন্ধু ফ্রাংক জেভারগ্রুভারকে গীটারের তালে একখানা নতুন গান বাধার অনুরোধ করেন। জেভারগ্রুভার অরর্গানের আয়োজনে গানে সুরারোপ করেন। এ ব্যাপারে একটা জনশ্রুতি আছে যে, ফাদার যোসেফ মোহর এমন একখানা নতুন গান চাইছিলেন যেন তিনি তাঁর নিজের গীটারের বাজনার সাথে বড়দিনের মধ্যরাত্রিকালীন খ্রিস্টযাগে শিশুদের দিয়ে পরিবেশন করে সকল অভিভাবকদের তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। এলক্ষ্যে মহড়াকালীন সময়ে হঠাৎ করে অর্গানটি ভেঙ্গে যায় এবং কোনক্রমেই তা থেকে কোন স্বরধ্বনি বের হচ্ছিলনা। এমতাবস্থায় বাচ্চাদের পুরো গানের দলটিকে নির্ভর করতে হয় শুধুমাত্র গীটারের সুরে তাদের কন্ঠসম্পদের ওপর। ১৮১৮ সনের মধ্যরাত্রিকালীন খ্রিস্টযাগে ফাদার যোসেফ মোহরও ফ্রাংক জেভারগ্রুভার তাদের দল-বল নিয়ে প্রথম 'The Silent Night' গানটি গান

মোহর ১৮২০-এর দিকে এ গানের গীটারের নোটেশনটি কাগজে লিপিবদ্ধ করেন যা এখনও সেলস্বাগ শহরের ক্যারোলিনো অগাস্টিয়াম মিউজিয়ামে যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী বছরগুলোতে 'Stille Yacht' ফ্রাংক জেভার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লিপিবদ্ধ করেন এবং তার পান্ডুলিপির সন্ধান ও গাওয়া যায়। 'Stille Nacht' বা 'The Silent Night' গানটি প্রথমে জার্মান ভাষায় লেখা হয় যা পরবর্তীতে ইংরেজীতে অনুদিত হয়ে রূপ নেয়,

Silent night, holy night,
Bethlehem sleeps, yet what light,
Floats around the heavenly pair;
Songs of angels fills the air.
Strains of heavenly peace.

অল্প সময়ের মধ্যেই এগান বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছু-কিছু ভাষাগত পরিবর্তন এলেও এর সুরের অন্তরনিহীতাও ভাব গম্ভীরতার কারণে এগানটি সারাবিশ্বে এখনও সমানভাবে সমাদৃত ও সর্বত্রগীত। অন্যান্য ভাষার মত বাংলায় এগানটি অনুদিত হযে নিম্নরূপ নেয় যাদু' বাংলার বিভিন্ন গির্জায় একই সুর বজায় রেখে বড়দিনের সময় গাওয়া হয়,

প্রশান্ত সে রাত্রি, গোশালে দুজন যাত্রী
অলোকপূর্ণ সেস্থান, ভেসে আসে দূতের গান
স্বর্গের শান্তি ঝরে!
প্রথমে শুনে গান, মর্তবাসীর পরিত্রাণ
আগত ত্রাণেশ্বর!
মাঠে মেষরক্ষী লোক, প্রথমে দেখে আলোক
আজি ঈশ্বরনন্দন, যাবপাত্রে করি শয়ন
আলোক তার ছাড়াইয়ে, আঁধার দেয় সরাইয়ে
বেথলেহেমের শিশু !!

গির্জার ভেতরে কিংবা বাইরেবা ঘরে পাঠ ও সংগীতানুষ্ঠানের মিশ্রণে গড়ে তোলা হয় বড়দিনের আগমণী আমেজ।

বড়দিন আত্ম-উপলব্ধির দিন।
বড়দিন আত্ম-পরীক্ষার দিন।
বড়দিন আত্মবিশ্লেষণের দিন।
বড়দিন সবার আত্ম-শুদ্ধির দিন।

আসুন এ বড়দিনে স্মরণ করি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে সফরে আসা

"Youth for Christ" গানের দলের বাংলায় গাওয়া সে গানটা

'স্বর্গে যেতে হলে তোমাকে শিশু হতে হবে'।
বড়দিন শিশুর মত সরলতার দিন।
জয় নবজাতক শিশু যিশুর জয়॥ ๑

আঠারো গ্রামের কাঙ্ক্ষিত বড়দিন

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

করে নিতে বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা বাড়িতে এসেছেন। আমরা ঘর সাজিয়েছি, ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়েছি, গোশালা তৈরি করেছি। অতিথিদের জন্য পিঠাপুলি, পায়েশসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করেছি।

বক্সনগর খ্রিস্টানপল্লীর সভাপতি জানান বড়দিন ঘিরে সপ্তাহব্যাপী অনেক রকমের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্যে নগর কীর্তন, বড়দিনের উপাসনা, কেক কাটা, পিঠা পর্ব, প্রীতিভোজ ও প্রাক প্রস্তুতি সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। থানা প্রশাসনকেও অবগিত করা হয় যাতে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারেন। আমরা আশা করি প্রশাসনসহ সবার সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমরা বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করতে পারবো।

বক্সনগর সাধু আন্তনী চার্চের সকল যিশুভক্ত বলেন, 'এই অশান্ত পৃথিবীতে যাতে শান্তি স্থাপন করা, আমাদের দেশে- দেশে, সমাজে-সমাজে, মানুষে-মানুষে যাতে কোন বিভেদ ও অশান্তি না থাকে, সে প্রত্যাশা নিয়ে এবারের বড়দিন উদ্‌যাপন করবো।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে আজকের দিনে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সকলের মঙ্গল কামনা করি এবং প্রত্যেক গির্জার ফাদার, সিস্টারস ও গানের দলসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা॥ ๑

সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

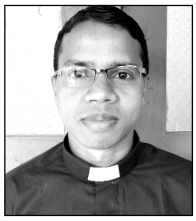

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

সৃষ্টিশীলতা সব সময়ই ইতিবাচক। মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষরাজি নতুন-নতুন জীবন ও কর্ম সৃষ্টি করে চলেছে। বাড়িয়ে চলেছে পৃথিবীর সম্ভার। এ সৃষ্টিশীলতার যাত্রায় মূলত কোন কিছুই থেমে নেই। যখন নতুন শিশুর জন্ম হয়, যখন নিজের হাতে লাগানো গাছ ফুল-ফল আসে, কিংবা লকলকিয়ে বেড়ে উঠা লাউগাছে যখন লাউ ধরে, যখন বাড়ির পোষা গাভী নতুন বাচ্চা প্রসব করে, যখন কোন বিজ্ঞানী নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, তখন মানুষ আনন্দিত হয়, গভীর অনুরাগে আন্দোলিত হয়। মূলত নতুন সৃষ্টি এবং নতুন প্রচেষ্টার ফল যখন মানুষ হাতে পায়, তখন হৃদয় থেকেই আনন্দ উথলে ওঠে।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষলগ্নে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস মহামারী সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে; বলা যায় বিশ্বকে প্রায় স্থবির করে দিয়েছে। মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গৃহবন্দী হয়ে বেরসিক জীবন-যাপন করেছে। তখন থেমে গিয়েছিল প্রায় সমস্ত কর্মযজ্ঞ। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, বুঝি বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল, বিশ্ব জুড়েই বুঝি কারফিউ জারি করা হয়েছে। এমনও সময় গেছে যখন বাংলাদেশের মানুষ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘদিন সূর্যের আলো দেখেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, কল-কারখানা, হাট-বাজার তথা সকল ক্ষেত্রই স্থবির হয়ে পড়েছিল। মানুষ দিনের পর দিন ঘরে শুয়ে-বসে প্রায় অলস সময় পার করেছে। পরবর্তীতে লকডাউন খুলে দেওয়ার পর আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু এরই মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও এর তোড় এসে পড়েছে। তবে কি এই প্রোটিন টাইপের নন-লিভিং মইক্রো অর্গানিজম আমাদের জীবনকে থামিয়ে রাখবে? সম্ভব নয়; কারণ যুগে-যুগে মানুষ এভাবেই বিভিন্ন মহামারীর মধ্যেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে, যা আমরা ইতোমধ্যেই শুরু করেছি। ইংরেজীতে একটি সুন্দর টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে- 'লিভিং উইথ নিউ নরমাল' অর্থাৎ নতুন স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে বসবাস। অন্যভাবে বলা যায়, পাল্টে যাওয়া জীবনের সঙ্গে অভিযোজন। সত্যিই তাই, মানুষ এই পরিবর্তিত সময়ের সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তবে পরোক্ষ দিক বিবেচনা করলে দেখা গেছে অনেক মানুষই আবার করোনাকালীন অবসর সময়টি দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। এ সময়টিতে মানুষের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। আমরা জানি, সাপ দীর্ঘদিন গর্তে লুকিয়ে থাকে। পুরো শীতকালটা সে ঘুমিয়ে আর বিশ্রামে কাটায়। এরপর যখন গরম পড়তে শুরু করে তখন সে বেরিয়ে আসে। তার গায়ের পুরনো খোলস সে ছেড়ে দেয়; গায়ে দেখা যায় নতুন চামড়া। সেটি তখন চকচক করে। ক্ষীপ্র গতি, সতর্ক দৃষ্টি আর দুর্দান্ত শক্তি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। করোনার প্রাদুর্ভাবের সময়েই সামাজিক মাধ্যমগুলোতে একটি কথা বেশ ঘুরে ফিরে আসছিল। কথাটি ছিল অনেকটা এ রকম- "করোনার নিষ্কর্ম সময়ে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন যখন তুমি কাজ করার সুযোগ পাবে তখন যেন সবাই তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করে"।

মনিষীগণ বলেছেন, "সাধারণ মানুষ সময় কাটানোর চেষ্টা করে, আর অসাধারণ মানুষ সময়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে"। চলমান করোনাকালীন সময়ের মতো এতো দীর্ঘ অবসর আমরা হয়তো সারাজীবনেও আর কখনও পাব না। তাই এ ধরণের অবসর সময় সঠিকভাবে কাজে লাগানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের বার্সেলোনার ইএই বিজনেস স্কুল থেকে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লকডাউনের ভেতর সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজের কিছু টিপস্ দেওয়া হয়েছে। টিপস্গুলোর মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ টিপস্ দেওয়া হয়েছে তা হল, "লকডাউনে আপনাকে এমন কিছু করতে হবে, যা অন্যদের চেয়ে আলাদা"। সৃষ্টিশীল, স্বকীয়! সত্যিই তাই। মূলত লকডাউন আমাদেরকে নিজস্বতা খুঁজে পেতে এবং নিজেকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমান বাস্তবতা হল, চাকুরীর বাজার আর আগের মতো নেই। তাই অনেকেই পেশা পর্যন্ত বদলে ফেলেছেন। চাকুরী না থাকায় অনেকেই নিজে কিছু করার চেষ্টা করেছেন, উদ্যোক্তা হয়েছেন। অন্যদিকে, অনেক কিছুই এখন আবার অনলাইনে হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি বিবেচনা করে অনেকেই ডিজিটাল পৃথিবীতে খাপ খাইয়েছে। যেহেতু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ, তাই অনেকেই বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সময়টাতে বিশেষ কিছু শেখার সুযোগ নিয়েছে। কেউ অনলাইনে গান শিখেছে, তবলা শিখেছে, গিটার শিখেছে, নাচ শিখেছে এবং ফ্রিল্যান্সিং এর মতো উচ্চতর বিষয়গুলোতেও ঢুঁ মেরেছে। যারা

সময়টি কাজে লাগিয়েছে তারাই মূলত জীবনযুদ্ধের জন্য নতুন রসদ যুগিয়ে ফেলেছে।

অনেক মা-বাবা, এমনকি প্রবীণ মানুষকে দেখা গেছে, তারা যা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু জীবন-জীবিকার কারণে হতে পারেননি বা করতে পারেননি, এই অলস সময়ে তারা তা করে ফেলেছেন। তারা নাই বা হলেন টিভি স্টার, মানী লেখক, জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী তবুও তাদের সময়টি তো ভাল কাটল, জীবনের সাধ তো পূরণ করা গেল! তাদের লেখা কিছু লোকও তো পড়ছে, তাদের ছবি কিছু লোকও তো দেখছে, তাদের গান কিছু লোক অন্তত শুনছে! তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পরবর্তী প্রজন্ম বা তাদের ছেলেমেয়েরাও জানলো, চেষ্টায় অনেক কিছু সম্ভব হতে পারে এবং শেখারও কোন বয়স সীমা নেই। পাশাপাশি, কর্পোরেট লাইফের অনেক বাবা-মা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না। কিন্তু এই সময়ে তারা খুব কাছে থেকে সমস্ত কিছু দেখভাল করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার যারা জীবিকার প্রয়োজনে পরিবার থেকে প্রায় সারা বছরই বিচ্ছিন্ন থাকেন, তারাও এ সময়টিতে পরিবারকে সময় দিতে পেরেছেন। পরস্পরের সাথে সময়গুলো অর্থপূর্ণভাবে সহভাগিতা করতে পেরেছেন।

পরিচিত অনেককেই দেখেছি ভিডিয়ো এডিটিং শিখে ফেলতে, নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে ইউটিউবের জন্য ভিডিয়ো তৈরি করতে, আপলোড করতে। কেউবা আবার টিকটক ভিডিয়ো বানিয়ে সেগুলোও ছেড়ে দিয়েছে। অনেকে নিজের গুণাবলীর প্রকাশ ঘটিয়ে গান রচনা করেছে, সুরারোপ করেছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছে। এমনও দেখা গেছে, যাকে কেউ কোনদিন গান গাইতে শোনেনি, সেও পাক্কা শিল্পীর মতো গান গেয়ে ফেসবুকে আপলোড করেছে। শুধুমাত্র করোনা মহামারীর উপরেই শত-শত গান, কবিতা, কমেডি ভিডিও, শর্টফিল্ম প্রভৃতি রচনা করা হয়েছে। মানুষও নানাভাবে নিজেকে প্রকাশের চেষ্টা করেছে। নারীদের বেলায় একটি বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয়। অনেক মেয়ে ও কর্মব্যস্তহীন নারী সেলাই শিখেছে, কাপড় বুনেছে, তুলি আঁচড়ে নানা রকম সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করেছে। অনেক ছেলে-মেয়েকে ওরিগ্যামীর বিভিন্ন কারিকুরি করতে দেখা গেছে। ইউটিউব দেখে পেপার কাটিং করে সুন্দর-সুন্দর ফুল, হাতপাখা, ঘুড়ি তৈরি করে ফেসবুকে আপলোড করেছে। যে ছেলে বা মেয়ে কোনদিন পেপার কাটিং করেনি, সে যদি ইউটিউব অনুসরণ করে কায়দা মতো কাগজ কেটে চমৎকার রঙিন কাগজের ফুল তৈরি করে ফেলে, তখন তার উথলে উঠা আনন্দ বুঝতে আমাদের এতোটুকু কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অন্যদিকে, যারা বই পড়তে ভালবাসে অথচ একাডেমিক পড়া-শুনার জন্য অন্যান্য বই পড়া হয় না, তাদের জন্য এ সময়টি ছিল পোয়া বারো! তারা প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কেউ-কেউ আবার আবৃত্তি শিখেছে, যাদের মুখে একটু জড়তা ছিল তারা নিয়মিত তর্জমা করতে করতে নিজেকে শাণিত করে ফেলেছে।

একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হল, করোনা মহামারী মানুষকে আরও সহজে আরও কাছে নিয়ে এসেছে। দূরে থেকেও যোগাযোগ রক্ষা ও কাজ চালানোতে অভ্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে মিটিং, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম মানুষ দূরে বসেই করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের অ্যাপ যেমন- জুম,স্কাইপ মিট নাউ, গুগল হ্যাংআউটস প্রভৃতি দারুণ কাজে দিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণেই বর্তমানে অনলাইন ব্যবহারের মাত্রা ও পরিধি বহুগুণে বেড়ে গেছে।

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক- আমাদের ঘর-বাড়ি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য আমরা সারা বছরই সময় পাই। তবে সাধারণভাবে আমরা ছুটির দিনগুলোতে বাড়ি-ঘরের বিশেষ-বিশেষ কাজগুলো সেরে থাকি। আবার অনেক কাজ আজ করবো, কাল করবো, পরশু করবো বলে পরিকল্পনা করতেই থাকি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটি আর করা হয়ে উঠে না। তবে করোনার থাবায় যখন কোথাও যাওয়ার জো ছিল না, তখন এ সকল অসমাপ্ত কাজগুলো সেরে ফেলার সুন্দর সুযোগ হয়েছিল। অনেক মানুষ তাই এ ধরণের কাজগুলো সেরেও ফেলেছে। ঘর-বাড়ি পরিস্কার করেছে, গুছিয়েছে। দীর্ঘদিনে জমে থাকা ধূলা পরিস্কার করেছে। অনেকে বাড়ি-ঘর নতুন করে সাজিয়েছে। এ সময়ে অনেককে রংয়ের মিস্ত্রি হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ নিজেদের বাড়ি নিজেরাই রং করেছে! খরচ কমলো, অভিজ্ঞতা বাড়লো আর বাড়িটাও নতুন হলো! মন্দ কি?

এবার একটু প্রকৃতির দিকে নজর দেওয়া যাক। পৃথিবী এ সময়ে সবুজে ছেয়ে গেছে। দিকে দিকে গাছপালা ও ঘাস জন্মেছে। কার্বণ নিসরণকারী অনেক কর্মযজ্ঞ থেমে যাওয়ায় প্রকৃতিও বিশ্রাম পেয়েছে; শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। চমকপ্রদ ব্যাপার হল, এ সময়ে অনেক বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী, পাখ-পাখালি ও গাছপালা চোখে পড়েছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারেও ডলফিনের দেখা মিলেছে! আবার চিড়িয়াখানার পশু-পাখিদের প্রজনন অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে বেড়েছে পশুর সংখ্যা।

করোনার প্রকোপ শেষ হয়ে যায়নি, উল্টো দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। তবে আমাদের দেশে প্রায় সবকিছুই আগের নিয়মে চলছে। লকডাউন শেষ হয়ে গেছে, কর্মযজ্ঞ রীতিমতো চলছে, চলছে অফিস-আদালত। এখন এই ব্যস্ততম সময়ে এসে অনেকেই হয়তো খুব আনন্দিত হয়েছেন, আবার কেউ হয়তো নয়; কেউ হয়তো খুব আফসোস করছেন। কারণ অনেকেই হয়তো ঘরে বসে কেবল মুভি আর সিরিয়াল দেখা ছাড়া বলতে গেলে খুব বেশি কিছু করেননি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাদের ফলাফল হাতে পায়, তখন অনেকেই হাপিত্যেস করে, "ইস্ কেন যেন আর একটু বেশি পড়িনি"। কিংবা পরীক্ষার হলে বসেও ভাবে, "কেন যে সেদিন ওই মুভিটা দেখলাম? ওটা না দেখে যদি ঐ অধ্যায়টা আর একটু পড়তাম, তাহলে কতই না ভাল হতো; পরীক্ষাটা আরও ভাল হতো"! সুতরাং দীর্ঘ অবসরকালীন সময়ে যারা নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারা নিশ্চয়ই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভাসছেন। একজন লেখক বলেছিলেন, "আমি এক একটি লেখা শেষ করি, আর আমার মনে হয় আমি আরও একটি সন্তানের জন্ম দিলাম"। সত্যিই তাই। নিজে কিছু করাটা যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনি আবার তা গভীর আনন্দের উদ্রেক করে। করোনার সর্বোচ্চ প্রাদুর্ভাবকালীন সময় থেকে অনেক কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, আবার অনেক কিছুই আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। কাজেই, হাতের কাছে যা আছে তাতেই তো আমাদের ফোকাস করতে হবে! আসলে, জীবন আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যায়, আমাদের তো সেখানেই প্রস্ফুটিত হতে হয়! প্রস্ফুটিত হওয়া এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই তো প্রকৃত সুখ ও আনন্দ॥

আনন্দময় হোক সবার জীবন : শুভ বড়দিন ২০২০

দাউদ জীবন দাশ

শুভ বড়দিন। বড়দিন খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর খ্রিস্টান সম্প্রদায় এই দিনটিতে মহান যিশু খ্রিস্টের পবিত্র জন্মদিন হিসেবে উদ্‌যাপন করে। এই উদ্‌যাপন আনন্দময়, এই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঈশ্বরপুত্র যিশুর অমোঘ শান্তির বাণী। ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, উদারতা, কৃতজ্ঞতা-এসব উৎকৃষ্ট মানবিক গুণ অর্জনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে উন্নততর মানবিক সম্পর্ক ও সুসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে প্রতি বছর মানুষের দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে শুভ বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর।

মানুষের ত্রাণকর্তারূপে প্রভু যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবজাতির মুক্তির স্মারক হিসেবে। হিংসা, বিদ্বেষ, পঙ্কিলতার পথ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন ভালোবাসা, করুণা, মিলন ও সুন্দরের পথ। যিশু মহামানব, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র এবং মানব জাতির মঙ্গল উৎস। তাঁর জন্মদিন শুধু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য আনন্দবার্তা বয়ে আনে না, পৃথিবীতে তাঁর আগমন সমগ্র মানবজাতির জন্যই আনন্দের। সবার কাছেই অনুসরণীয় তিনি।

সংযম-সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা ও সেবার পথ ধরে মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আনার প্রয়াসে প্রভু যিশুকে অবর্ণনীয় নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু সত্য ও কল্যাণের পথ থেকে কোনো কিছুই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। নিপীড়কের বিরুদ্ধে তিনি পাল্টা আঘাতের কথা বলেননি; তিনি অকাতরে ক্ষমা করেছেন, আর সমগ্র মানবজাতির হয়ে সব দুঃখ-যন্ত্রণা যেন একাই আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। আজকের হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-রক্তপাতের পৃথিবীতে যিশুর প্রদর্শিত সহনশীলতা-সহমর্মিতার পথই প্রকৃত এবং একমাত্র শান্তির পথ।

যিশুর শিক্ষা কী? পাশবিকতাকে জয় করে প্রকৃত মানব হয়ে ওঠা ও মানুষকে ভালোবাসা। তিনি আশাহীন মানুষকে দিয়েছেন আশা; জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত মানুষকে জুগিয়েছেন জীবন জয়ের অনুপ্রেরণা। যুদ্ধ ও অশান্তির বিপরীতে যিশু মানুষকে ডেকেছেন মমতা-ভালোবাসা ও মিলনের পথে।

যুগে-যুগে মহামানবগণ আবির্ভূত হয়েছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে, যখন মানবতা ভুলুণ্ঠিত ছিল; পৃথিবী হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানী, লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ ছিল। যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবও সেরকমই এক অন্ধকার সময়ে, যখন জেরুশালেমসহ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বন্দীদশা থেকে মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। শিশু যিশু এলেন দরিদ্র বেশে বেৎলেহেমের গোয়াল ঘরে। মুক্তির বারতা নিয়ে তিনি এই পৃথিবীতে জন্ম নিলেন। যিশু এসেছিলেন অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে, পীড়িতদের সুস্থ করতে, আশ্রয়হীনদের আশ্রয়, অনাহারীদের মুখে অন্ন এবং প্রকৃত অভাবী ভাই-বোনদের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আর এই জন্যই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তিনি; জগতের সকল মানুষকে দেখিয়েছেন হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে ভালবাসার পথ।

যিশুর বাণীতে বলা হয়েছে- 'অন্তরে যারা সৎ, হৃদয়ে যারা বিনয়ী, শান্তিকে আলিঙ্গন করে যারা, ধন্য তারা। যারা দরিদ্রকে সাহায্য করে; অসহায়-পীড়িত-আশ্রয়হীনদের আশ্রয় এবং সেবা করে, ধন্য তারা। তারাই একদিন স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকারী হবে।' প্রার্থনা, দানকর্ম ও উপবাস বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে বলা আছে, 'যখন তুমি প্রার্থনা কর, চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িও না বরং নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার ঈশ্বরকে ডাক। তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তখন তুঁরী বাজিয়ে তা ঘোষণা করতে যেওনা। গোপনেই ভিক্ষা দাও। আর যখন উপবাস কর তখন ভণ্ডদের মত মুখ বিষন্ন করে রেখো না, ববং মাথায় তেল মেখো, চোখ-মুখ ধুয়ো; যাতে তুমি যে উপোস করছো মানুষ যেন তা জানতে না পারে। তাহলে তোমার ঈশ্বর; যিনি গোপন সবকিছুই দেখতে পান তিনিই তোমার সকল ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন।' *(মথি: ৬:৬-১৮)*

পৃথিবীর বিলাসী ও লোভী-ধনী মানুষদের সতর্ক করে পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে- ''ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কিন্তু বেশ কঠিন হবে। ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে কোন উটের পক্ষে একটা সুঁচের ছিদ্রের মধ্যদিয়ে যাওয়াই বরং সহজ হবে।" কাজেই এই পৃথিবীতে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ সঞ্চয় করার চেয়ে আমাদের উচিত পরকালের জন্য ঐশসম্পদ সঞ্চয় করা। অর্থাৎ প্রকৃত অভাবী-দরিদ্র-দুখী ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা, উন্নয়নের অংশীদার করা এবং উন্নয়নের সুফল সহভাগিতা করা।

কাজেই পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সত্যিকারের সুখী-সমৃদ্ধিশালী শান্তির সমাজ বিনির্মাণে দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, কৃষক-কামার-তাঁতী-জেলে-ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবী সবাইকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে; সম্পদ ও সামর্থ পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবেই আধুনিকতার উৎকর্ষতায় হারিয়ে যেতে বসা মানুষের সামগ্রিক জীবনের উন্নয়ন স্বার্থকতা পাবে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, তারা ধর্মভীরু। তারা খ্রিস্টান ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে মিলে-মিশে এ দেশে বসবাস করছেন। সেজন্য আমরা বিশ্বাস করি, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এই উৎসবের দিনে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার সঙ্গে যিশুর আবির্ভাবের এই আনন্দ আমরা ভাগ করে নিতে সক্ষম হব। বিভেদ নয়, সম্প্রীতির বন্ধনে আমরা পরস্পরকে বেঁধে রাখব, সেবাধর্মে নিজেকে উৎসর্গ করব, এটাই যিশুর আদর্শ এবং শিক্ষা। শুভ বড়দিন॥

আজ স্বর্গীয় আলোয় উজ্জ্বল ধরণী

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ

অপরূপ সৃষ্টির নিয়ন্তা যিনি, তিনি হলেন ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি এই বিশ্বের রূপকার, তিনি ভালবাসা ও প্রেমের আকর। তাই তিনি ভালবাসার রং তুলি দিয়ে প্রেমের দৃষ্টিতে রচনা করলেন এই সুন্দরতম ভূবন। সবুজ-শ্যামলে ঘেরা প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে তাকালেই আমরা বলতে পারি- অপূর্ব ঈশ্বরের এই সৃষ্টি, আকর্ষণীয় আমাদের এই ধরণী। শুধু পৃথিবীকে রূপের মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং পৃথিবীকে এক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে তুললেন। পৃথিবীর মানুষকে তাঁর প্রেমের বাঁধনে সারাজীবন বেঁধে রাখতে চাইলেন। তাই তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে ঈশ্বর এই মাটির ধরায় প্রেরণ করলেন। তাঁর পুত্র শিশু যিশুকে প্রেরণের মধ্যদিয়ে মানুষের মাঝে নব রুপ, নব জীবন সঞ্চার করলেন। আর আজ সেই শিশু যিশু খ্রিস্টের পুন্যময় বড়দিন উৎসব অর্থাৎ যিশুর জন্মোৎসব আমরা পালন করছি। আজ বড়দিন, তাই সকলের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে তাকালে দেখি, সকলেই বড়দিনের আনন্দে সজ্জিত হয়েছে, বাড়ীঘর অনেক সুন্দর করে সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রতিটি বাড়ির ওপরে এক উজ্জ্বল তারা, বাড়ির আঙ্গিনা জুড়ে বিভিন্ন ফুলের সমাহার, ঘাসের ওপরে ফোঁটায়- ফোঁটায় পড়ে থাকা শিশির বিন্দু, ঘরে-ঘরে সোনালী ফসলের তৈরী সুস্বাদু পিঠা-পায়েশ আর কেক, মানুষে-মানুষে ভালবাসা আর মহামিলনের আকাঙ্খিত আনন্দের আসর, প্রতিটি পরিবারে যেন এক মিলন তীর্থের আয়োজন। সবকিছু মিলিয়ে যেন এক স্বর্গীয় আলোয় ঢেকে আছে এই ধরণীটি। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর ২৫ ডিসেম্বর। একটি বছরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, হুতাশা-নিরাশা, হীনমণ্যতা ও বিচ্ছেদের পরে আবারো ফিরে এলো ডিসেম্বর মাস। এ মাসটি যেন পুরো একটি বছরের মনের মধ্যে জমে থাকা অব্যক্ত কষ্টগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে অন্তর মন্দিরে আনন্দের এক নতুন পল্লব অঙ্কুরিত করেছে দিয়েছে। সকল হুতাশা-নিরাশাকে দুরে, ঐ নীল আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিটি মানুষের জীবনকে ভরিয়ে দিল ভালবাসার সুরভিতে।

প্রভু যিশু ঈশ্বর প্রেমের চিহ্ন হিসেবে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই খ্রিস্ট জন্মোৎসব হল অন্যতম। এ বড়দিন উৎসব যেন ছড়িয়ে আছে প্রতিটি পরিবার তথা সারা বিশ্ব জুড়ে। তাই আজও, এবারের এই পুণ্যময় বড়দিনে স্বর্গীয় আলোয় উজ্জ্বল প্রতিটি মানব জীবন। আজ হতে ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ পূর্বে মুক্তিদাতা যিশু সাধু যোসেফ ও মাতা মেরীর কোলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজকীয় বেশে নয় বরং অতি দীনবেশে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। যদিও তিনি অতি দীন বেশে জন্ম নিলেন তারপরেও সেই দিনটি ছিল উজ্জ্বল আলোকময়, বিশ্ব মানবজাতির জন্য একটি অমূল্য দান, একটি উপহার। যে মুহূর্তটিতে যিশু পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সেই মুহূর্তটি ছিল মানব জীবনের জন্য এক সোনালী সম্ভাবনার ভবিষৎ। কারণ, তাঁর আগমনেই মানুষের সমগ্র জীবনটা আলোকিত হয়েছে, পাপের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গীয় আবাসে স্থান পেয়েছে।

সত্যিই, তাঁর এ জন্মোৎসব যেন এক অপরিসীম ভালবাসার শ্রেষ্ঠ দান। কারণ, কোন কিছুর পরিবর্তেই ঈশ্বর ভালবাসলেন জগতকে ও জগতের সকল মানুষকে। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, গোটা পৃথিবীর কর্তৃত্বভার তাঁরই হাতে কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষকে তিনি সমান মূল্য দিয়েছেন। ধনী-গরীব, উঁচু- নীচু, পাপী-সাধু সবাইকে সমান মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তাঁর ভালবাসায় তিনি পাপীকে যেমন স্থান দিয়েছেন, তেমনি হত দরিদ্র অসহায় মানুষকেও তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে আহ্বান করেছেন। অনুতপ্ত পিতরকে যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি ব্যভিচারিনী স্ত্রীলোকটিকেও কঠিন পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। সেই শক্তিমান ঈশ্বর মর্তে আগমন করে পুরো পৃথিবীটাকে উজ্জ্বল আলোকময় করে তুলেছেন। পাল্টে দিলেন সমগ্র জগতটাকে। সূচনা করলেন মানুষের অন্তরে প্রদীপ্ত শিখা। যার ফলে রচিত হলো স্বর্গীয় সুখের ভালবাসার নীড়।

আজ সমগ্র বিশ্বে শিশু যিশুর জন্মোৎসবে জগৎ ও মানুষের মাঝে যে আনন্দ বিরাজ করছে, যে উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে আছে, যে সুর পৃথিবীর আকাশে-বাতাশে ধ্বনিত হচ্ছে, যে খুশীর বন্যা প্রান্তর জুড়ে প্লাবিত হচ্ছে তা যেন ক্ষনিকের বা কিছু কালের জন্য না থাকে। ঈশ্বর চান তা যেন প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে থাকে।

জগতের বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখি ভালোর পাশাপাশি কিছু মন্দতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অশান্তি, মনোমালিন্য, অরাজকতা এবং ঝগড়া-বিবাদ। এগুলো মানুষকে ভাল কিছু থেকে বঞ্চিত করে। মানুষের যে মহৎ ব্যক্তিত্ব থাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। এমনকি মানুষ নিজের মনুষত্বকেও হারিয়ে ফেলে। যার কারণে এই উজ্জ্বল আলোকময় পৃথিবীটা অন্ধকারের কালো আঁধারে ঢেকে থাকে। শিশু যিশুর প্রদীপ্ত শিখাটি ধীরে-ধীরে নিভতে থাকে। ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ আস্তে-আস্তে সরে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিময় সর্ম্পককেও ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। অপরদিকে মানুষ পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও দূরত্ব সৃষ্টি করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বটাই রাতের আঁধারে ডুবে যাচ্ছে এবং মানুষও অন্ধকারের বেড়াজালে জীবন-যাপন করছে।

কিন্তু আজ ঈশ্বর, বিশ্বের প্রতিটি মানব জাতীর কাছে প্রত্যাশা করেন, মানুষ যেন শিশু যিশুর উজ্জ্বল আলোয় হৃদয়-মনকে আলোকিত করে তোলে। তাহলে পুরো বিশ্বটাই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

আসুন এবারের বড়দিনে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সাথে হাতে হাত রাখি এবং এক সাথে নব উদ্যমে সামনের পথে অগ্রসর হই। পরস্পরের সাথে প্রেমের বাঁধনে এক হয়ে পথ চলি। বিশ্বকে আলোয় আলোকিত করে তুলি॥

বড়দিনের মজা

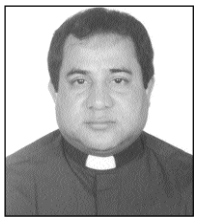

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

বড়দিন, খ্রিস্ট প্রভুর জন্মদিন। আমাদের জন্য একটি আনন্দ উৎসব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকলেই এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাপিডিয়া হলো বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ। এখানে উল্লেখ আছে, "বড়দিন যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবে পরিণত হয়েছে।" বড়দিন সবার উৎসব। বড়দিনের নির্মল আনন্দে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষই অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মের মানুষের মাঝেও এর ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লাভ করছে। বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং আমাদের পবিত্র সংবিধানেও সেটা স্বীকৃত। সব ধর্মের বড় বড় উৎসবগুলোতে সবার অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ও সমার্দিত।

সবার মনেই একটা প্রশ্ন– ২৫ ডিসেম্বর কেন বড়দিন? বাইবেলে কোথাও উল্লেখিত নেই যে যিশু খ্রিস্ট কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে পালন করা শুরু হয় রোমে। এরপর ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ জুলিয়াস এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে ঘোষণা করেন। এবং সেই থেকে ২৫ ডিসেম্বর দিনটিকে ক্রিস্টমাস ডে হিসেবে পালন করা হয়। ক্রিস্টমাসকে আমরা এক্সমাস-ও বলে থাকি। X- অক্ষরটি এসেছে গ্রীক অক্ষর– যে গ্রীক শব্দ Christos এর প্রথম অক্ষর যার ইংরেজী অর্থ হলো Christ.

চারিদিকের বর্ণিল সাজ-সজ্জা, উপহার কেনা আর বাহারী সব পোশাক পরিহিত চমৎকার সাজে মানুষজন আমাদের প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছোটদের জন্য এদিনটি খুবই স্পেশাল বা বিশেষ ও মজার। বড়দিনের আয়োজনের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার ও মজা করার অনেক উপাদান থাকে। বড়দিনের সময় যে বিষয়গুলিতে শিশুরা বেশি আনন্দ পেয়ে থাকে এখন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব।

সান্তাক্লজ

এবার দেখা যাক সান্তা ক্লজ-এর উৎপত্তি কিভাবে হয়। সান্তা ক্লজ আসলে কে? বড়দিনের অন্যতম বড় আকর্ষণ হলো এই সান্তা ক্লজ। সান্তাক্লজ বলতে আমরা যাকে চিনি তিনি লাল রং-এর পোশাক, চুঙ্গা আকৃতির লম্বা টুপি, সাদা চুল ও দাঁড়িওয়ালা এক লম্বা লোক। রহস্য হলো কে এই সান্তা? কোথা থেকে এলেন, কেমন করে তাঁর আবির্ভাব, কেনই বা ঘুরে-ঘুরে শিশুদের মাঝে উপহার বিতরণ করেন?

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আজ যাকে আমরা সান্তাক্লজ বলে চিনি তার পিছনে রয়েছে লম্বা কাহিনী। ঊনত্রিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে লাল জামা, টুপী ও সাদা চুল-দাঁড়িওয়ালা লোকটির সন্ধান মিলে। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক চরিত্রে এই লোকটি ছিলেন সেন্ট নিকোলাস নামের একজন ধর্মযাজক। এশিয়া মাইনরের তুরস্ক নামক অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই মহৎ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দান-দক্ষিণায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল চারিদিকে। তিনি তাঁর সম্পদ অসহায় গরীব মানুষদের সহায়তায় ব্যায় করেন। তিনি তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের দান করে দেন। তাঁর এই মহানুভবতার জন্য তিনি মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন।

একবার এক পিতার তিন মেয়েকে অনেক টাকায় দাসী হিসেবে বিক্রি করা হয়। আর নিকোলাস সেই মেয়েদের রক্ষা ও উদ্ধার করে তাদের বিয়ে দেন। যৌতুক বাবদ সব খরচ তিনিই বহন করেন। তাঁর এই মানবতার জন্য তিনি মানব রক্ষক হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, পরিচিত বিশ্বাস অনুযায়ী নিকোলাস ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ও মধ্যরাতে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে উপহার দিতেন। পর্তুগীজ ভাষায় তাঁর নামটিকে স্টে নেকোলাস বা সেন্টার ক্লাশ বলা হত। তাঁর এই নামানুসারে পরবর্তীকালে তাঁকে সান্তা ক্লজ বলে ডাকা হয়।

সান্তা ক্লজের পোশাকের রং প্রথমে লাল ছিল না। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কোকাকোলার একটি বিজ্ঞাপনে সান্তাক্লজের একটা ছবি ব্যবহার করা হয়। এবং গ্রাফিক্স আর্ট্রিষ্ট সান্তা ক্লজের পোশাকে কোকাকলার অফিসিয়াল রং লাল এবং সাদা ব্যবহার করেন। এবং তখন থেকে সান্তাক্লজের পোশাক লাল এবং সাদা রং-এর হয়ে যায়।

ইউএসএ-তে সান্তাক্লজ নামের একটি পোস্ট অফিস আছে। যেখানে সান্তা ক্লজের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা যায়। এটি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে খোলা হয়। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে এই পোস্ট অফিস থেকে ২২ হাজার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। এছাড়াও কানাডাতে সান্তাক্লজের একটি পোস্ট অফিস আছে যেটির পিন কোড হলো– H0H0H0.

জিংগেল বেল গান

ক্রিস্টমানের জনপ্রিয় গান "জিংগেল বেল" আসলে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে বানানো হয় নি। এই গানটির আসল নাম "one horse open sleigh যেটি Thanksgiving এর জন্য বানানো হয়েছিল এবং Thanksgiving এর জন্য গাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি খুব জনপ্রিয় হওয়ায় এটি শব্দ পরিবর্তন করে ক্রিস্টমাসের অফিসিয়াল নামের পরিচিতি দেওয়া হয়। বড়দিনের সময় এই গানটি নেচে-গেয়ে সবাই আনন্দ করে থাকে।

ক্রিস্টমাস ট্রি

জার্মানীতে প্রথম বসন্তকে আগমন জানানোর জন্য ক্রিস্টমাসের দিন ক্রিস্টমাস ট্রি সাজানো হয়। তারপর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইউএসএ-তে এই প্রথা চালু হয় এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে ইউএসএ-তে ২৫ ডিসেম্বর দিনটিকে অফিসিয়াল হলিডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বড়দিনের অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টানদের প্রায় সব বাড়িতেই ক্রিস্টমাস ট্রি সাজানো হয়। প্রথম কৃত্রিম ক্রিস্টমাস ট্রি-টি টয়লেট ব্রাশ দিয়ে বানানো হয়েছিল।

মোজা

ক্রিস্টমাসে নতুন মোজা ঝুলানোর প্রচলন আছে। এটির পিছনে একটি গল্পও প্রচলিত আছে। বলা হয় রোমে একজন গরীব মানুষ ক্রিস্টমাসের দিন বাড়ির পাশে তার মোজা শুকাতে দেয় এবং সকালে ঐ মোজার মধ্যে কিছু সোনার কয়েন খুঁজে পায়। এবং তারপর থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে যে ক্রিস্টমাসের দিন বাড়িতে মোজা ঝুলিয়ে রাখলে সান্তাক্লজ তার মধ্যে উপহার রেখে যাবে।

সান্তা ক্লজ পোস্ট অফিস

সুইডেনে ক্রিস্টমাসের দিন ডোনাল ডাকের কার্টুন দেখার প্রচলন আছে। ইউএসএ-তে ২০০ কোটি ক্রিস্টমাস কার্ড পাঠানো হয় এবং ৯৩৬ কোটি টাকার গ্রিপ্ট রেপার ব্যবহার করা হয় এবং দুই লক্ষ টন চকলেট খাওয়ানো হয়। বড়দিনে নতুন জামা পড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেরানো মধ্যেও অনেক মজা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড়দিনের সময় বিভিন্ন ধরণের পিঠা তৈরী করা হয় যা সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যে অনাবিল আনন্দ আছে। আসলেই বড়দিনের সময় আমরা যে আনন্দ পেয়ে থাকি ও মজা করি অন্য কোন সময় মনে হয় না আমরা এই আনন্দ পাই বা মজা করতে পারি॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *ইন্টারনেট*

বড়দিনের বৈঠক

সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ

"খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তো সকলে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের সবকিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিতভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালবাসত। প্রভু পরিত্রাণের পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল।" *(শিষ্যচরিত ২: ৪৪ ৪৭)*

আমাদের বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজে বড়দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাড়িতে বড়দিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামের কয়েকটা বাড়ির সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়। এই সমাজের লোকেরা কীর্তন করতে করতে একটি বাড়িতে মিলিত হয়। সে বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করে তা পরিবেশন করে থাকে। এভাবে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন বাড়িতে মিলিত হয়ে সমাজের লোকেরা সেই বাড়ির লোকদের পরিবেশিত পিঠা-পুলি আনন্দ সহকারে ভোজন করে থাকে। এ আনন্দ উৎসব বেশ কয়েকদিন যাবৎ চলতে থাকে।

উপরে উল্লিখিত শিষ্যচরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পদে আদি মণ্ডলীর সংঘবদ্ধ জীবনের যে চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বর্তমান যুগের খ্রিস্টসমাজের বড়দিনের বৈঠকের মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। উল্লেখ্য "আদি মণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের ঘরে রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান করত এবং আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত। সকলেই তাদের ভালবাসত।" বড়দিনের বৈঠকেও এক বাড়িতে সবাই মিলিত হয় এবং একসঙ্গে আনন্দ সহকারে খাওয়া দাওয়া করে। কীর্তন গান করে পরমেশ্বরের বন্দনা করে। খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে একতা, ভালবাসা, কীর্তন, পরমেশ্বরের বন্দনা গান জগতের কাছে এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় আদর্শরূপেই প্রতিভাত হয়।

তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, বর্তমান খ্রিস্টীয় সমাজের এ সুন্দর প্রথা অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। এমন কি কোন-কোন গ্রামে তা বন্ধ হয়ে গেছে। আগের মত একতা ও ভ্রাতৃপ্রেম খ্রিস্ট সমাজে লক্ষ্য করা যায় না। এটা সত্যি অতি বেদনাদায়ক। খ্রিস্ট কিন্তু খিস্টানদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং এর জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় ভবিষ্যত খ্রিস্টাবশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে যিশু বলেছেন, "পিতা তারা যেন এক হয়, আমরা দুজনে যেমন এক।" খ্রিস্টের সেই প্রার্থনা যেন অনেকটা ব্যর্থ হতে চলেছে। তবে খ্রিস্টমণ্ডলী কিন্তু থেমে নেই। মণ্ডলী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে খ্রিস্টের এ প্রার্থনা যেন পুনর্জীবন লাভ করে। আদি মণ্ডলীর সেই সংঘবদ্ধ জীবন যাত্রায় মানুষ যেন আবার ফিরে আসে। তাই মাতামণ্ডলী সক্রিয় খ্রিস্টীয় সমাজ (BCC) গঠন করে এর মাধ্যমে ভ্রাতৃসমাজে একতা, মিলন, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতা করে আদি মণ্ডলীর সংঘবদ্ধ জীবনে যেন ফিরে যেতে পারে সেই পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই তো দেখি বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে গ্রামে-গ্রামে মানুষ একত্রিত হয়ে ঐশবাণী পাঠ, ধ্যান ও সহভাগিতা করে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন, দীন-দুঃখী ভাই-বোনদের প্রয়োজনে নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে।

বর্তমান মণ্ডলীকে বলা হয় অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী। বর্তমানে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের অনেকেই সপ্তধাপ পদ্ধতিতে ঐশবাণী পাঠ, ধ্যান ও সহভাগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে চাচ্ছে। বড়দিনের বৈঠকের মূল বিষয়ই হল অংশগ্রহণ এবং এ কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে এ প্রত্যাশা রাখি। পরিশেষে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত বড়দিনের বৈঠকের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ॥ ক্ষ

এক নব-শিশুর আগমন

সাগর এস গমেজ

ঐ শোন আকাশে-বাতাসে বহিছে এক বার্তা
আসিছে এক নবীন শিশু নব তাহার বার্তা।
ধূপ, ধূনো আর স্বর্ণ নিয়ে
থেকো তুমি প্রস্তুত,
মোদের তরে আসিছে শিশু
নিয়ে নব বার্তা।
প্রণাম করো নত মস্তকে
মুক্তিদাতা তিনি।
বিশ্বধরায় পাপীর তরে
আসিতেছেন যে তিনি।
বাণী থেকে মানুষ হবেন
তোমার আমার জন্য,
তৈরী থেকো তুমি মানব
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য।
হিংসা, বিভেদ, অহমের মাঝে
আনবেন তিনি শান্তি,
বিশ্ব ধরা মুক্তি পাবে
থাকবে না কোন ক্লান্তি।
স্বর্গে শিশু বন্দনা করে
করে স্তুতিবাদ
মর্তে মানব আমরা তাঁহার
সতত করি ধন্যবাদ।
ধন্য হবে ধরা তখন
প্রভুর আগমনে
আমরা তোমার করবো জয়ধ্বনি
প্রতি জনে-জনে।
এসো প্রভু এসো তুমি
মোদের এ ধরায়
আমরা যে আছি তোমার মহা প্রতীক্ষায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বড়দিন

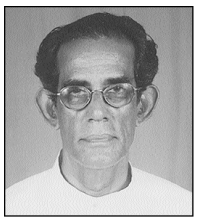

ফাদার আবেল বি রোজারিও

আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করছে ৭১'র বড়দিন। তবে সেখানে যাবার আগে একটু পিছনে ঘুরে আসি। আমি ১৯৭০ খ্রিস্টবর্ষের বড়দিন ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নববর্ষে ফাদার জন কস্তার সাথে বালুচরা ধর্মপল্লীতে ছিলাম। বড়দিন ও নববর্ষ অর্থাৎ ছোটদিন দুটোই সাব-প্যারিস বরুয়াকোনায় উদ্‌যাপন করলাম। আমি ২৪ তারিখ বরুয়াকোণায় গেলাম এবং সেখানে মিশা উৎসর্গ, পিঠা খাওয়া হলো ও কীর্তন হলো। পরের দিন সকালে মিশা দিয়ে চা-নাস্তা করে বালুচরা ধর্মপল্লীতে ফিরে আসলাম।

তারপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নতুন বছরে বরুয়াকোনায় গেলাম এবং একইভাবে রাতে মিশা, পিঠা খাওয়া ও কীর্তন হলো। তারপর পর দিন মিশনে ফিরে গেলাম। তখনো কিন্তু আমরা পাকিস্তানের সাথে। এরপর শুরু হলো আমাদের দুর্দিন। মার্চ মাসের ২৫ তারিখে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নয়মাস অনেক কষ্টে ছিলাম, যা বলার মত নয়। বালুচরাতে একটি ঘোড়া ছিল, সেটির নাম ছিল পান্থি। গারো ভাষায় 'পান্থি' মানে যুবক। সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে প্রতি রবিবারে ইন্ডিয়ায় খ্রিস্টযাগে দিতে যেতাম। আর পাকবাহিনীরা বালুচরায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে আসতে থাকে। তখন গারোরা ভারতের রংরাতে দলে-দলে যেতে লাগল। তারা ভারতের রংরাতে বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকতে লাগল। আর আমি সেই ক্যাম্পে প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগ দিতে যেতাম। তারপর জুলাই মাসের দিকে যখন দেখলাম, দেশটা শান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি ফাদার জন কস্তাকে বললাম, আমি ঢাকা ও গ্রামের বাড়িতে যাব। পরিস্থিতি কিছুটা শান্তভাবে ভেবে তিনিও না করলেন না। আমি ও ভাওয়াল অঞ্চলের ৪জন যুবক মোট ৫জন ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম। আর সেদিনই আমরা নেত্রকোণা গেলাম। আর নেত্রকোণায় গিয়ে ট্রেন পেলাম এবং ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। ট্রেন যাচ্ছে আর যাচ্ছে, ব্রহ্মপুত্র ব্রীজ পার হবার আগে ট্রেনটি থামল। ঐসময় পাক সৈন্যরা ট্রেনে উঠে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে আমাদের ব্যাগ ও সবকিছু চেক করল। তারপর ব্রহ্মপুত্র ব্রীজ পার হয়ে ময়মনসিংহ স্টেশনে গেলাম তখন রাত ১০টা বাজে। ট্রেন থেকে যখন নামতে লাগলাম, আমার সাথে ৪ জনের সবার শার্টের উপরে রোজারিমালা ছিল এবং আমার ক্যাসাক ও ক্রুশ ছিল। ট্রেন থেকে নামার সময় কিছু আলবদর বাহিনী আমাদেরকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করল, আর তখন আমাদের একজন উত্তর দিল, আমরা খ্রিস্টান। তখন তারা আবার বলল, আপনাদের চিহ্ন কি? তখন তারা রোজারিমালা দেখাল। মিশনতো কাছেই আমরা মিশনে যাব। তখন তারা আমাদের নিষেধ করল, আপনারা বের হবেন না, কারণ সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছে যেকোন সময় গুলি করতে পারে। সারারাত আমরা স্টেশনে কাটালাম। তারপর ঢাকা থেকে একটি ট্রেন আসল এবং পাক সেনারা সেখানে নামল আর দোকানে চা-রুটি ও কলা খেল। টাকা-পয়সা না দিয়ে যার-যার মত করে সকলে চলে গেল। তারপর স্টেশন থেকে সকালে আমাদের ছাড়ল আর আমরা তখন মিশনে গেলাম। ফাদার যোসেফ বব আমাদের দেখে অবাক হলেন। তারপর ঢাকা থেকে তুইতাল গ্রামের বাড়িতে গেলাম। এরপর দশ বারোদিন থাকার পর আবার আমরা দুইজন লোক ও একজন গারো মেয়ে আর আমি মোট ৪জন রওনা দিলাম। ভালোমত ময়মনসিংহ এ আসলাম। যখন আমরা নেত্রকোনা যাব পথে ওই জাগয়ার অবস্থা নিস্তব্ধ আর থমথমে ছিল। আর সেখানে একজন হোটেলের লোক বলল আপনারা আসছেন কেন, কয়েক ঘন্টা আগে খুব যুদ্ধ হয়ে গেল। আর আমরা বললাম, আমরা ঠাকুরগাঁও যাব আর তারপর বড়দল। লোকটি আমাদের নিষেধ করে দিল এবং আমরা সারারাত ঐ ছোট হোটেলের মত জায়গায় কাটালাম। পরদিন সকালে আমরা কোন যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। কিছুদূর গেলে পরে আলবদর বাহিনী আমাদেরকে ধরল এবং বলল আপনারা ইণ্ডিয়া যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে বললাম, আমরা বালুচরা মিশনে যাব আর সেখান থেকে বড়দল। আলবদর বাহিনীরা তারপর আমাদের ব্যাক চেক করল, কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের ছেড়ে দিল। আমরা হেঁটে ঠাঁকুরগাও গেলাম তারপর ঘাটে গিয়ে নৌকায় মাঝিদের বললাম বড়দল যাবে কিনা; বেশি টাকা দিতে চাইলাম কিন্তু কেউই ওপারে যেতে চাইল না। অবশেষে ১০০ টাকা দিয়ে এক মাঝি রাজি হল আর তিনি আমাদের চুপচাপ নৌকায় বসে থাকতে বলল। মাঝি আসতে আসতে নাজিপুর দিয়ে বড়দল আমাদের নিয়ে গেলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যার দিকে। আমি তখন মেয়েটিকে নিয়ে সোজা বালুচরা মিশনে গেলাম। তারপর ঘরে এসে কান ধরে মনে-মনে বললাম জীবনে আর এত বড় রিস্ক নিব না।

তারপর ৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে পাকবাহিনী বালুচরা মিশনে আক্রমণ শুরু করল। ইতোমধ্যে আমরা খাবার-দাবার, টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র ব্যাগে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। যখন মিশনের কম্পাউন্ড এ একটা বোমার সেল পড়ল তখন দুই পরিবার ও ফাদারের কর্মচারীসহ আমরা মোট ১২জন ছিলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ায় যেতে লাগলাম। যখন সেল আমাদের সামনে এসে পড়ে আবার আমরা শুয়ে পড়ি আবার যখন বন্ধ হয় আমি সবাইকে উঠতে বলি। এইভাবে আমরা ইন্ডিয়ার কাছে আসলাম এবং যখন উঠলাম তখন দেখি ফাদার জন কস্তা নেই। তারপর অজয় ও আমি দুজনে মিলে ফাদারকে খুঁজতে বের হই। বেশ কিছুটা যাবার পর কাদার মধ্যে ফাদারকে খুঁজে পেলাম। ফাদারকে পুকুরে গোসল করিয়ে দিয়ে একটি বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তারপর আমি অজয়কে নিয়ে মিশনে গেলাম, মিশনে গিয়ে দেখি গির্জাঘর ভাঙ্গা, মিশনে গরুগুলো দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে আর ঘোড়া পালাতে পারেনি বলে তারা ঘোড়াটাকে মেরে ফেলল।

ভারতের রংরার কিছু যুবক-যুবতী আসল

এবং আমাদের সব জিনিসপত্র ও চাউল ধান নিয়ে গেল। রংরায় তারা আমাদের জন্য তিনটা রুম বানিয়ে রেখেছিল। আমার জন্য, ফাদারের জন্য এবং মিশার জিনিসপত্র রাখার জন্য। তারপর আমরা ভাগ করে নিলাম আমি এক সপ্তাহ ইণ্ডিয়ায় থাকি আবার ফাদার এক সপ্তাহ বালাদেশে থাকে। এভাবে পালা বদল করে থাকি। বাংলাদেশে যখন থাকতাম কখন কোন রকম পেঁপে সিদ্ধ করতাম ও ভাত রান্না করতাম। আর যুবকরা আমার জন্য মাঝে-মাঝে ইণ্ডিয়া থেকে খাওয়া নিয়ে আসত। তুরা থেকে ফাদার জর্জ স্টাড আমাকে বলেন, আমার এখানে আসেন এবং রেস্ট নেন। ওখানকার ইনচার্জ ক্যাপ্টেন চৌহান রাজপুতকে বললাম আমরা মিশনে যাব আমাদেরকে অনুমতি দেন। তারপর ইনচার্জের কাছ অনুমতি পত্র নিয়ে তুরাতে গেলাম। ফাদার জর্জ স্টার্ড আমাদের বললেন, আপনারা স্বাধীনতা পাইবেন কিন্তু আপনারা শান্তিতে থাকতে পারবেন কি? আমার তো তা মনে হয় না। ওখান থেকে গেলাম গো-হাটি ২দিন থাকার পর তারপর গেলাম শিলং। এ শিলং এ ১০ দিন থাকার কথা ছিল। তখন নভেম্বর মাস। কিন্তু শীতের তিব্রতার কারণে আমরা ৭/৮ দিন থাকার পরেই শিলং এর আর্চবিশপ হিউবার্ট রোজারিওকে বলি, এখানে অনেক শীত আমরা রংরায় ফিরতে চাই। আর্চবিশপ আমাদের বললেন, এ আর কি শীত; যদি আর শীত অনুভব করতে চান তাহলে জানুয়ারি আসেন। আমরা ডিসেম্বরের ৩ তারিখে আমরা রংরায় আসলাম।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারত সরাসরি পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি ৩ তারিখেই ওপার থেকে এপারে আসি। আর ঐ ৩ তারিখ রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা ফিরতে শুরু করে। ৪ তারিখ সকাল থেকেই নেত্রকোণার চর্তুদিকে শুধু শুনি 'জয় বাংলা' ধ্বনি। ডিসেম্বরের ৪ তারিখেই ঐ এলাকা স্বাধীন। সকালের নাস্তা সেরেই আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি পরিস্থিতি দেখতে। বালুচরা থেকে ১১/১২ মাইল হেঁটে বিরিশিরিতে আসলাম বড় ক্যাম্পের অবস্থা দেখতে। বিরিশিরি থেকে হেঁটে চলে গেলাম রাণীখং এ। মিশনে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার হেঁটে যাত্রা শুরু করলাম বালুচরার পথে। সারাদিন ধরে শুধু হাঁটলাম আর হাঁটলাম। ঐদিন এতো আনন্দে ছিলাম যে, সারাদিন কিছু না খেলেও কোন ক্ষুধা লাগেনি। কোন ক্লান্তি নেই শুধু আনন্দ আর আনন্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় দিবস ঘোষণা হলেও নেত্রকোণায় ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকেই বিজয়ের স্বাদ অনুভব করতে থাকি। খ্রিস্টান গারোরা যারা ইণ্ডিয়া চলে গিয়েছিল তারা ডিসেম্বরের শেষের দিকে বড়দিনের জন্য বাড়ি আসতে থাকে। বাড়িতে তেমন কিছুই ছিল না। পাকবাহিনী সমস্ত কিছুই তছনছ করে দিয়ে যায়। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ নিয়ে গরীব গারোরা নিজেদের ঘর মেরামত করতে থাকে। ক্ষেত্রে নাড়া দিয়ে থাকার ঘরের ব্যবস্থা করতে থাকে। মিশন থেকেও তাদের সহায়তা করা হতে থাকে। ২৫ ডিসেম্বর আমরা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করলাম নির্ভয়ে, স্বাধীনভাবে ও আনন্দ সহকারে। এসময়ে অনেক ক্ষতি হলো কিন্তু আনন্দের কমতি ছিল না। সারারাত কীর্তন করা হলো। এতো আনন্দ হলো যে তা ভাষায় ব্যক্ত করে বুঝানো যাবে না। এতো আনন্দ আর কোনদিন করিনি॥

সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই শুভ বড়দিন ২০২০ এবং নতুন বছর ২০২১ এর শুভকামনা! করোনাভাইরাস থেকে মানব জাতির মুক্তি প্রার্থনা করি!

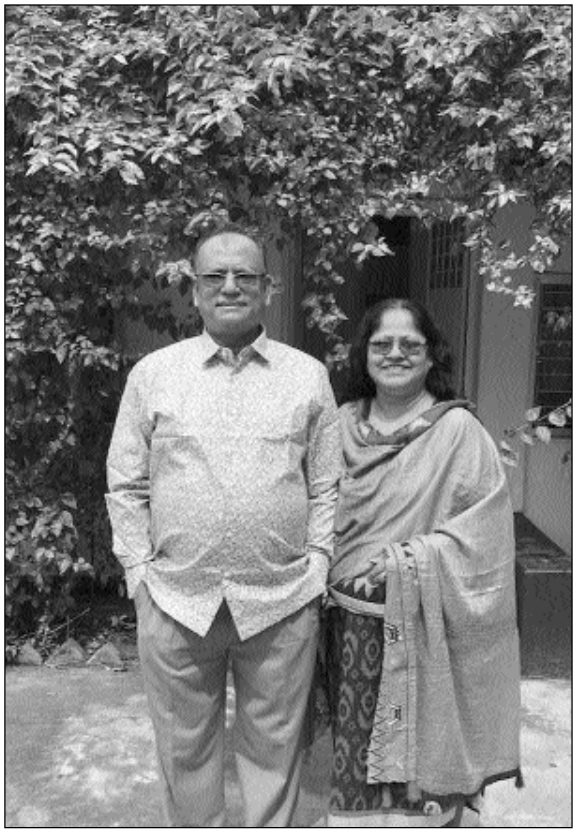

শুভেচ্ছান্তে
কর্ণেল (অবঃ) যোসেফ অনিল ও
মনিকা রোজারিও
ও মারভিন, মার্টিন- রিমি ও নাথান
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

আঠারোগ্রামের কাঙ্ক্ষিত বড়দিন

এরশাদ আল মামুন

ঢাকা দোহার-নবাবগঞ্জ উপজেলার আঠারোগ্রামের খ্রিস্টান ধর্মপল্লীর প্রতিটি বাড়িতে জমে উঠতে শুরু করেছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সর্বোবৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান "বড়দিনের" নানা আয়োজন। প্রকৃত পক্ষে আঠারোগ্রামের প্রায় প্রতিটি গ্রামই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং অভিন্ন সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে ভাবনায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। উৎসব মানেই অনাবিল আনন্দ, উপহার প্রদান, উপাসনা, পারিবারিক মিলনমেলা, গৃহসজ্জা, উৎসব মানেই একটি বছরের অপেক্ষার আশার আলো। মানুষের আন্তরিকতা ভালোবাসা জোয়ার-ভাটার খেলায় যে কোনো উৎসব আয়োজনে প্রাণ ফিরে পায় দোহার নবাবগঞ্জের আঠারো গ্রামের প্রতিটি পার্বণে। বড়দিনকে সামনে রেখে বর্ণিল সব আয়োজনে নিজ-নিজ বাড়ি ঘর সাজানো, উঠোনে অতিথিদের পদচারণায় আনন্দের জোয়ারে সবাই যেন মাতেয়ারা ও একাকার। আঠারো গ্রামের খ্রিস্টান মহল তাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও নিজস্ব সত্তাকে আঁকড়ে ধরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়িক সম্প্রতিকে সবার উর্ধ্বে রেখে পালন করে তাদের প্রতিটি পার্বন। শান্তির নীড় ও ধর্মীয় সম্প্রতির উর্বর অঞ্চল বলে খ্যত এ-ই আঠারো গ্রাম এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এবং আত্ম নির্ভরশীলতায় ভরা এই আঠারো গ্রামের মূল বৈশিষ্ট্য।

গ্রামগুলির মাঝ দিয়ে বহমান এক সময়ের খড়স্রোতা ইছামতি নদী আর দক্ষিনে বিস্তীর্ণ আড়িয়াল বিল আর নদীর দুই পাড় ঘেষে রয়েছে অত্যাধুনিক কারুকাজে খঁচিত শৈল্পিক ও নান্দনিকতার ছোঁয়ায় নির্মিত প্রায় ছয়টি গির্জা, হাসনাবাদ গির্জা, গোল্লা গির্জা, তুইতাল গির্জা, সোনাবাজু গির্জা ও দোহার ইক্রাশি গির্জা, সেখরনগর শোলপুর গির্জা এবং আমাদের বক্সনগরে সাধু আন্তনির গির্জা। সারা বাংলাদেশের তুলনায় আঠারো গ্রাম ছোট এলাকা হলেও এই গ্রামের শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং ধর্মীয় কর্মকান্ড বেশ এগিয়ে রয়েছে। কিংবদন্তিতুল্য সঙ্গীত জগতের অমর শিল্পী ওস্তাদ পি সি গোমেজসহ অনেক গুনিজনের জন্মগ্রহণ এই আঠারো গ্রামে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আঠারো গ্রামের রয়েছে অনেক অবদান তন্মধ্যে বক্সনগরে আছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মরণীয় ঘটনা।

অহংকারের আরেক নাম শহীদ ফাদার উইলিয়াম পি ইভান্স সিএসসি। তিনি ছিলেন বিদেশি যাজক। তিনি যাজকীয় মর্যাদা লাভ করেন ১০ জুন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান (বাংলাদেশ) আসেন ৬ জানুয়ারি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোল্লা গির্জা থেকে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নৌকা যুগে বক্সনগর গির্জায় যাবার পথে নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ইছামতি নদীর তীরে ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পাকহানাদার বাহিনীরা বুলেট ও বেয়নেটের আঘাতে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। তাই এই গ্রামগুলিতে বেঁচে থাকা অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমাদের অহংকার।

যে কথা বলতে চেয়েছি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড়দিন একটি সর্ববৃহৎ এবং পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই দিনটিতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বিরা যিশু খ্রিস্টের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। যদিও বাইবেলে যিশুর জন্মের কোন দিনক্ষণ পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্ম তারিখ ধরা হয়। উপহার বিনিময় করা, ক্রিসমাস ট্রি সাজানো, দই মিষ্টি পিঠা পুলি বিতরণ করা এবং অবশ্যই সান্তা ক্লজের অপেক্ষা করা যেন বড়দিনের সাড়া বছরের প্রতিক্ষার ফসল।

খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট এই দিনে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, বিশ্বে শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই তার আগমন হয়েছিল।

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব 'শুভ বড় দিন'। আর এই উৎসব উদ্‌যাপনে নবাবগঞ্জের ১৮টি গ্রামের প্রতিটি ঘরে মহা উৎসবের আনন্দঘন সম্মিলিত প্রস্তুতি। ডিসেম্বর এলেই এই গ্রামগুলির খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি ঘরে-ঘরে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। উপসানালয় সহ বাড়ি বাড়ি আলোকসজ্জা, গোশালা তৈরি, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোসহ নানা প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সকল নারী পুরুষ যুবক যুবতিরা। বড়দিনে ক্রিসমাস ট্রি তো অনেকেই দেখেছেন। সবুজ গাছে হরেক রকম জিনিস ঝোলানোর পরে যখন লাইটগুলো জ্বলে আর নেভে, তখন শুধু পুরো গাছটি নয় পুরো প্রকৃতিকে দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। গাছটিকে আপেল, পাখি, মোমবাতি, ঘুগু, মাছ, ফুল, ফল আর স্বর্গদূত দিয়ে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর মজাটাই আলাদা। নানা রঙের আলোয় সাজানো এই ক্রিসমাস ট্রির প্রচলন কিন্তু একদিনে হয়নি কিংবা বলা যায় শুরু থেকে ছিলও না।

স্বজনদের সঙ্গে বড়দিনের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ডিসেম্বরের শুরু থেকেই প্রবাসিসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মজীবিরা নাড়ীর টানে ছুটে নিজ গ্রামে, তাদের পরিবারের সাথে আনন্দ ভাগা-ভাগি করে একাকার হবার প্রত্যাশায়। কারণ যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি সবার মাঝে হানাহানি আর বৈষম্য দুর করবে এই প্রত্যাশা সকলের।

বড়দিন উপলক্ষে যিশুর আগমন বার্তা সবাইকে জানান দিতে একদিন আগে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দলবেঁধে সংকির্তনের পোষাকে খোল আর ঝুরির বাজনার তালে নেচে গেয়ে চলে নগরকীর্তন দল। বড় দিন ঘিরে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে বাড়ির গৃহিনীরা বাড়িঘর আলোকসজ্জা আর পিঠাপুলির আয়োজন মুখরিত হয়ে উঠে সকলের ঘরে ঘরে। বাঙ্গালির লোকজ ইতিহাস ঐতিহ্যের পিঠা-পুলির গুরুত্ব অনেক। এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ।

বক্সনগর গ্রামের এক যুবক জানায়, বড়দিন উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকের মাঝে আনন্দ বিরাজ করছে। সে কারণে প্রত্যেক বাড়িতে সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা করেছি। প্রত্যেক বাড়িতে গোশালা স্থাপন ও সেটিকে সাজিয়ে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। বড়দিনের আনন্দ ভাগ

(৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সান্তাল কৃষ্টিতে বড়দিন

আলবেনুস সরেন

ভূমিকা : বড়দিন খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের খ্রিস্টানরাও এই উৎসব যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হচ্ছেন সান্তাল বা সাঁওতাল সম্প্রদায়। আজকে সান্তাল কৃষ্টিতে বড়দিন উৎসব সর্ম্পকে জানব।

মারাংদিন মারাংদিন মেনাকু বয়হা-
(বড়দিন বড়দিন লোকে বলে বড়দিন-)
মারাংদিন দ অকা দিন কান?
(বড়দিন আসলে কবে?)
ডিসেম্বর চান্দু রেয়াক্ মিত্ ইসি মঁড়ে তারিক-
(ডিসেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখ-)
অনাদিন দ মারাংদিন কান।
(ওই দিন হচ্ছে বড়দিন)

এই রকম শত শত খ্রিস্টীয় গান রচনা করা হয়েছে সান্তালি ভাষায় বড়দিনকে কেন্দ্র করে।

শুরুর কথা : বড়দিনকে সান্তালি ভাষায় বলা হয় 'মারাং দিন'। একেবারে সঠিক অনুবাদ। 'মারাং' শব্দের অর্থ বড় এবং 'দিন' অর্থ দিন। সঠিক জরিপ জানা না থাকলেও প্রায় সবাই স্বীকার করেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ সান্তালরা বর্তমানে খ্রিস্টধর্মের অনুসারি। বাংলাদেশের কাথলিক ধর্মপ্রদেশগুলোর মধ্যে রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশ ও দিনাজপুর কাথলিক ধর্মপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাথলিক খ্রিস্টান হচ্ছেন সান্তালরা। খ্রিস্টধর্ম শুরু থেকেই সান্তালদের নিজস্ব ভাষার মধ্যদিয়ে প্রচারিত হয়েছে। তাই সান্তালদের কাছে খ্রিস্ট ধর্ম কখনও বিদেশি ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। মণ্ডলী কখনও সেখানে বিদেশি ভাষা বা সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেনি। খ্রিস্ট ধর্ম মিশনারিদের মাধ্যমে সান্তালদের কাছে 'সান্তালিকরণ' হয়েই এসেছে। বড়দিন উৎসবও তাই হয়ে গেছে 'মারাং দিন'।

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি : যে কোন উৎসবেই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি এক বড় বিষয়। মিশন কেন্দ্র থেকে ফাদারগণ সর্বাত্মক চেষ্টা করেন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি দিতে। অধিকাংশ গ্রাম মিশন কেন্দ্র থেকে দূরের এলাকায় অবস্থিত, তাই বড়দিনের আগে জোর কদমে চলে মফস্বল প্রোগ্রাম। মিশনের ফাদার, সিস্টারগণ বড়দিনের আগে সাধ্যমত চেষ্টা করেন গ্রামে পৌঁছাতে। সান্তাল অধ্যুষিত প্যারিশগুলোতে এই সময় নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। গ্রামে পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত, মিশা উৎসর্গ ইত্যাদি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কোথাও কোথাও নতুন প্রার্থীদের দীক্ষা প্রদান করা হয়। গ্রামে কোন সমস্যা বা দলাদলি থাকলে সমাজপতিরা চেষ্টা করেন সেটির সমাধান করতে। যাতে সবাই সুন্দর মন নিয়ে যিশুর জন্মোৎসব পালন করতে পারেন।

নভেনা : খ্রিস্টীয় রীতি অনুসারে সান্তাল অধ্যুষিত ধর্মপল্লী ও গ্রামগুলোতে নভেনা করা হয়। নভেনা অনুষ্ঠিত হয় সান্তালি ভাষায়, তাই নভেনা প্রার্থনা সান্তালদের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

বড়দিনের গান ও অনুষ্ঠান প্রস্তুতকরণ: গ্রামের বেশির ভাগ গির্জাগুলোতে লক্ষ্য করা যায়, নভেনা প্রার্থনার পর বড়দিন উপলক্ষে গানের মহড়া হয়। এই মহড়া সান্তাল ভাষায় দক্ষ্য কোন ব্যক্তি পরিচালনা করেন। বড়দিনের গান ও খ্রিস্টযাগ যাতে সহজবোধ্য ও মনোমুগ্ধকর হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়।

বড়দিনের খ্রিস্টযাগ 'সান্তালিকরণ': বড়দিনের খ্রিস্টযাগের গানগুলো সাধারণত 'সহরায়' সুরে গাওয়া হয়। এর একটি বিশেষত্ব আছে। পূর্বে সান্তালরা যখন অখ্রিস্টান ছিল,তখন তাদের মধ্যে 'সহরায়' নামে উৎসব ছিল। এই উৎসবটি আমন ধান কাটার পর পালিত হত। সচরাচর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিক থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। বড়দিন এই সময় টাতেই পালিত হচ্ছে, তাই সহরায় সুরের গান এই সময় বেশি উপযোগি। সহরায় সুরের গান বড়দিনে বেশি প্রযোজ্য বলে ভাবা হয়।

বড়দিন অনুষ্ঠান বা বড়দিনের গানগুলো সান্তালিকরণের এটি বড় উদাহরণ।

সান্তালদের মধ্যে বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টযাগের সান্তালিকরণ সান্তালদের মাঝে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছে।

বসত-বাড়ি পরিস্কার : সান্তাল গ্রামগুলো বড়দিন আসলেই যেন নতুন সাজে সেজে উঠে। ঘরবাড়িগুলো লেপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। উৎসব হবে অথচ বাড়িঘর পরিষ্কার থাকবে না এটা সান্তালরা কল্পনাও করতে পারেন না। যদি কোন বাড়ি-ঘর অপরিষ্কার থাকে তাহলে সেই বাড়ির গৃহিণীদের সামাজিকভাবে বিভিন্ন নিন্দা মন্দ কথা শুনতে হয়। তাই সবাই ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখতে সচেষ্ট হয়। বাড়ির দেয়ালে আলপনা এঁকে নতুন করে সাজানো হয়। এভাবেই এক নবজাগরণের মধ্যেদিয়ে বড়দিন উদ্যাপিত হয়।

বড়দিনের খাবার : বড়দিনের খাবারের মধ্যে 'সুনুম পিঠা' বেশি প্রচলিত। এটি এক ধরনের পিঠা যা তেল দিয়ে বানানো হয়। এছাড়াও ডুম্বুক্, খাপরা পিঠা, কাডামেত্ পিঠা, মুড়ি, ইত্যাদি বেশি জনপ্রিয়। মুড়ি দিয়ে চা পান করা হয়। বর্তমানে আধুনিক পশ্চিমা খাবারও পরিবেশিত হচ্ছে। এভাবে খাদ্যাভাসে পরিবর্তন হচ্ছে।

বড়দিনের গান : সান্তাল সমাজে যে কোন অনুষ্ঠানে গান বা নাচ একটি বড় অনুসঙ্গ। নাচ বা গান ছাড়া কোন অনুষ্ঠান সান্তাল সমাজে কল্পনা করা কঠিন। এদিক লক্ষ্য রেখে সান্তালি ভাষায় বড়দিনের গান রচনা করা হয়েছে। এই গানগুলো শুধু শ্রুতি মধুর নয় বরং অর্থবোধক। বড়দিনের গান গুলোতে যিশু খ্রিস্টের জন্মের মহত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরণের কিছু গানের কথা উল্লেখ করা হল-

চব্বিশে ডিসেম্বর রাতের গির্জায় 'সহরায় ' সুরে খুব জনপ্রিয় নিম্নোক্ত গানটি গাওয়া হয়-

১। দে সে দেলা, বয়হা, তাড়াম তাড়ামপে হো,

(চলুন ভাই বোনেরা জোর কদমে চলুন)
চালাকমাবুন, বয়হা-বেথলেহেম গড়াতেগি,
(চলুন ভাই বোনেরা বেথলেহেম গোশালায়)
নেঁলে অড়হেঁ বয়হা-প্রভু যিশু মাশি।
(প্রভু যিশু মশিহকে দর্শন ও অর্পন করে

আসি)

২। তিহিঞগি চং বয়হা- নিসুন তালা নিনদো

(আজকের দিনে গভীর রাত্রিতে)

হুডিঞ আতু বয়হা - বেথলেহেম বিলোন টান্ডি,

(ছোট গ্রাম-বেথলেহেমের প্রান্তরে)

গড়ারে হো যিশু-নানদান জানামাকান।

(গোশালায় যীশু দারিদ্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন)

৩। হেড়ান দায়া বয়হা-হেড়ান মারাং দুলোড়!

(অনেক দয়া ভাই বোনেরা,অনেক বড় ভালোবাসা!)

আডি নিনধোন, বয়হা-মাহির আর বাপুড়িচ্

(ভাই বোনেরা অনেক দারিদ্রতা, নিরবতাকে সংগে নিয়ে)

গড়া নান্দ্ওয়ারেগি- কুচোলেনায় যিশু।

(গোশালায় যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন)

এই ধরণের গান বড়দিনের মিশাকে অর্থবহ করে তোলে।

এভাবে শতাধিক গান রচনা করা হয়েছে,যে গানগুলোতে যিশুর জন্ম কাহিনী খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গান গুলো বড়দিন সান্তালিকরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বর্তমানে আরও নতুন নতুন গান রচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর সাথে বিশ্ব খ্রিস্টমণ্ডলীও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

দিনাজপুর কাথলিক ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাহা সান্দিস' বইটি খ্রিস্টীয় উপাসনা সান্তালিকরণে বড় অবদান রেখেছে এবং এখনও রাখছে।

খ্রিস্টীয় কীর্তন : বড়দিনের সময় সান্তাল সমাজে কীর্তন বহুল প্রচলিত প্রথা। সান্তালি ভাষায় এই কীর্তন 'গাদয়' নামে পরিচিত। গ্রামের ছেলে মেয়েরা এই কীর্তনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। 'গাদয়'-এর সময় 'বাহা সান্দিস' ও 'নাওয়া রোড়' এই খ্রিস্টীয় বই দুটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বহুল চর্চিত একটি কীর্তনের ভাষা এই রকম। যা 'দুরুমজাক' সুরে গাওয়া হয়-

১। দূতকু দূতকু মাকু দুংগুত্ দুংগুত্দক্

(সকল দূতেরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে)

আয়ু গ নেঁলকুপে-(২)

(আপনারা সবাই দেখুন)

বেতলেহেম টান্ডিরেকু দুংগুত্ দুংগুত্ক

(বেথলেহেম প্রান্তরে জড়ো হয়েছে)

২। যিশু মাশি জানামতেকু সিরিঞজংকান

(যিশু মশিহের জন্মে সকল দূতেরা গান গায়)

আয়ু গ আন্জমপে (২)

(আপনারা সবাই শুনুন)

যিশু মাশি জানামতেকু সিরিঞজংকান

(যিশু মশিহের জন্মে সকল দূতেরা গান গায়)

৩। দেলা বয়হা বিরিত্পে সারহাওইমাবুন

(চলুন ভাই বোনেরা একসঙ্গে জয়গান গাই)

আয়ু গ মিত্ মনতে (২)

(সকলে এক মনে)

গটা মনবুন সামাংআয়া সারহাও সিরিঞতে

(পুরো মন সঁপে দেব জয়গানের মধ্য দিয়ে)

উপসংহার: প্রত্যেক উৎসবই তার নিজস্ব গন্ডি ছাড়িয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। বড়দিন শুধুমাত্র খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলোতে নয় বরং তুলনামূলকভাবে কম উন্নত দেশ বা সম্প্রদায়কেও সমানভাবে আলোড়িত করে। আর এটাই বড়দিনের নিজস্ব দর্শন, যে দর্শনে সার্বজনীনতা বিদ্যমান। সবাইকে মারাং দিনের যোহার! ও যিশু মারাং।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বাহা সান্দিস। ৯

প্রয়াত মার্গারেট ফ্রান্সিসকা গোমেজ

জন্ম: ১৭ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

লোকাণী বাড়ি, বান্দিভিয়র

গোল্লা ধর্মপল্লী

মৃত্যু: ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তেজকুনীপাড়া, ঢাকা

সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেলো যে জন,
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন।

তুমি ছিলে আমাদের আশ্রয়, ছিলে আমাদের ভালোবাসা, আমাদের মা, মার্গারেট গোমেজ, পিতা-মৃত: ফ্রান্সিস রজ্রিক্স, মাতা-মৃত: আগ্নেস রজ্রিক্স-এর দ্বিতীয় সন্তান, স্বামী-মৃত: জন গোমেজ, পন্টনবাড়ি, বড়গোল্লা, আমাদের মা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর চাকুরীর সুবাদে পরিবারসহ চট্টগ্রামে (পাথরঘাটায়) অবস্থানরত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় রাজাবাজারে বড় মেয়ের বাড়িতে শয্যাশায়ি ছিলেন। বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল ৯:৫২ মিনিটে ৮১ বছর বয়সে তেজগাঁও-এ তেজকুনীপাড়ায় বসবাসরত ছোট-মেয়ের বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, সদালোপী, উদার, নম্র এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী, তার জীবিত ও মৃত্যুকালে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করছি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

ছেলে: রনি

মেয়ে: মিনি, বেবী, লিলি, এভলিন, জ্যাকলিন, মেরীলিন, আইলিন ও

ছেলের বউ, জামাতাগণ, ৪ নাতি, ৮ নাতনি, ও পুতিন।

মফস্বলে বড়দিন অভিজ্ঞতা

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

বড়দিন একটি আনন্দময় মহোৎসব। শ্রী যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব। মানব জাতির পাপময় জগৎ থেকে মুক্তির জন্যেই এই যিশু জন্মগ্রহণ করেন। আর এই জন্মোৎসব পালনের জন্য আমাদের অধীর আগ্রহ নিয়ে এবং প্রত্যাশাপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকি। বড়দিনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও বিশ্বাস গঠনের জন্য আমাদের বহু কার্যক্রম হাতে নিতে হয়। তার মধ্যে হলো একটি বিষয় মফস্বল। মফস্বল হলো একটি ধর্মপল্লীর অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে বিশ্বাসীবর্গগণ বাস করেন। বহু দূর-দূরান্ত গ্রামে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বাস করেন। তাদের পালকীয় যত্ন ও আধ্যাত্মিক গঠনের জন্য ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ প্রোগাম অনুসারে তাদের কাছে যায়। পাপস্বীকার শ্রবণ করা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ, পরিবার পরিদর্শন, রোগি বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত বিতরণ করতে হয়। প্রয়োজনে রোগিলেপন দেওয়া হয়। তাছাড়া গ্রামের খ্রিস্টভক্তদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সংলাপ করতে হয়, তাদের সমস্যা শুনতে হয়। অনেক সময় সমবায় সমিতি, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সাথে সহভাগিতা, সহমর্মীতাভাব নিয়ে একাত্ম প্রকাশ করতে হয়। বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠি আদিবাসী, তাছাড়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোন-কোন প্যারিশে বাঙালি পরিবার আছে। বিশেষভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠি নিস্ব পরিবার, ভূমিহীন, দিন মজুর; দিন আনে দিন খায় তাদের কাছেই আমাদের যেতে হয় মঙ্গলবাণী প্রচার করার জন্য। প্রার্থনা সভা, নির্জন ধ্যান, মতামত বিনিময়, পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করতে হয়। আদিবাসী পরিবেশ নিয়ে আমাদের জীবন। তাদের সাথেই বড়দিন উৎসব পালন করি, অনুভব করি আনন্দ। আদিবাসী জনগোষ্ঠি কায়িক পরিশ্রম না করতে পারলে তাদের পরিবারে অন্ন জুটে না। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে বাণীপ্রচারক থাকেন। তারা মাসের প্রথম শুক্রবার ধর্মপল্লীতে আসেন আর ফাদার সিস্টার, কাটেখিস্ট মাস্টার রবিবাসরীয় পাঠের ব্যাখ্যা পরিচালনার কাজে সহায়তা দিতে পারেন। তাছাড়া প্রচারক প্যারিশে আসেন তাদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ, পাপস্বীকার শ্রবণ করে থাকি। আর প্যারিশের বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই প্যারিশের বড়-বড় সমস্যাগুলো যেমন বৈবাহিক, জায়গা-জমি, পারিবারিক কোন্দল, দ্বন্দ্ব নিরসনে ফাদারগণ সহায়তা দান করে থাকেন। তাছাড়া ধর্মপল্লীর প্রধান কাটেখিস্ট, সিস্টারগণ আগের দিন গ্রামে গিয়ে থাকেন। তার ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা, গান বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি করে থাকেন। আর ফাদারগণ সকাল হলেই ছুটে চলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন আদিবাসীদের অবস্থান। তাদের পরিবেশ, পরিবার, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। অনেক সময় তাদের নিজস্ব ভাষায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করতে হয়। কোন-কোন গ্রাম অনেক বড়, আবার ছোট ছোট গ্রামও আছে। সবার কাছে আমাদের যেতে হয় বাণীপ্রচারের জন্য। মফস্বল একটি আনন্দদায়ক আধ্যাত্মিক যাত্রা। কোন-কোন গ্রাম আছে দূর-দুরান্ত ফাদারগণের সব সময় যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। বাস্তবিক পক্ষে বছরের দুটো খ্রিস্টযাগ পেয়ে থাকেন বড়দিন ও পাস্কার সময়। সত্যিই মফস্বলে বড়দিন খুবই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার বিষয়। অনেক সুষ্ঠু পরিবেশ নেই, তবে আগের তুলনায় অনেকটা ভাল। গ্রামে খাদ্যের তালিকায় যা জুটে তাই ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই খেয়ে আনন্দ অনুভব করি। বাঙালি পরিবার গ্রামতো আছে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, আঞ্চলিক ভাষাও আছে। সব যিশুর সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। সত্যিই এই বড়দিন আমার জন্য আনন্দদায়ক কারণ গ্রামবাসীরা ফাদার, সিস্টার, প্রচারকদের রাতে জায়গা করে দেন, থাকার ব্যবস্থা করে দেন। নিজেরা ত্যগস্বীকার করে আমাদের আশ্রয় করে দেন। হাসিমুখে আমাদের আপ্যায়ন করে থাকেন। তারা মনে করেন কি জানি ঠিকমত খাওয়াতে পারলাম কিনা। তাদের নিয়েই আমি আনন্দ অনুভব করি। এবারের বড়দিন অভাবি দুঃখীজনের সাথে আমার বড়দিন। ফাদারদের জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন কবে ফাদার আসবেন খ্রিস্টযাগ দিতে। আমাদের দেখে তাদের আনন্দের সীমানা থাকে না। আবার এমন আছে দিন মজুর কাজ না করলে অন্ন জুটে না। তবে স্বাবলম্বী মানুষও আছে। আমার খ্রিস্টভক্তজনগণ আমারই। আবার পরিবেশে কিছু জিনিসের অভাব হলেও তা মেনে নিতে হয়। শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক-যুবতি সর্বস্তরের মানুষের মন-মানসিকতার সাথে খাপ-খাওয়াতে হয়। অনেক গ্রামে গির্জা নেই তবে ছোট পরিসরে, পরিবারে টেবিল সাজিয়ে খ্রিস্টযজ্ঞ অর্পণ করে থাকি। বড়দিন মানেই আনন্দের। বড়দিনে গ্রামবাসীরা বড়দিনের আনন্দ অনুভব করে থাকেন। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে বড়দিনে বাদ্যযন্ত্র, নাচ, গান ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বড়দিন উৎসব পালন করে থাকেন। ভক্তজন খুবই ত্যাগী। ফাদারদের আপ্যায়নে সজাগ ও সতর্ক। শিশুরা আরও আনন্দপ্রিয়। বড়দিন এর আগে প্রত্যেক দিন মফস্বলে ছুটে যেতে হয়। সব গ্রামে খ্রিস্টযাগ দিতে হবে এবং যেতেও হচ্ছে। কোন-কোন গ্রামে রাতে থাকার সুযোগ হয়েছিল বিশেষভাবে, দূর-দূরান্তে গ্রামগুলোতে। রাতে খ্রিস্টযাগ, পরের দিন সকালে অন্য গ্রামে খ্রিস্টযাগ মোটরসাইকেল আমার পিছনে আরেক আরোহী তিনি হলেন কাটেখিস্ট। তিনি বলেন, ফাদার আপনার খ্রিস্টযাগের ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আর আমি নিশ্চিন্তে ছুটে চলি ভক্তজনগণের সন্ধানে। অনেক গ্রাম আছে কিন্তু ভক্তজনগণ আছে খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা ভুলে গেছে, উত্তর দিতে অপরাগ। অনেক সময় ধৈর্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিই। বিরক্ত হলেও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেই। কারণ আমি জানি, আমি তো তাদের জন্যই প্রেরিত ও মনোনীত। ধর্মশিক্ষা দানের জন্যেই এসেছি। সত্যিই মহামারী করোনার মাঝেই যিশুর জন্ম। আমিও আনন্দ করব আমার ভক্তজনগণ যেন যিশুকে চিনতে পারে, বিশ্বাস দিয়ে ভক্তিভরে গ্রহণ করতে পারে যিশুকে। বড়দিন মফস্বলেই যিশুর জন্ম হবে। দরিদ্র পরিবারেই শিশু যিশুর জন্ম হবে॥

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

Happy New Year 2021

MERRY CHRISTMAS

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৮ম মৃত্যু বার্ষিকী

"ভুলিনি তোমায়, ভুলব না কোনদিন
যতদিন রবে প্রাণ
প্রার্থনা করি, হে প্রভু তাঁকে দিও
তোমার পাশে স্থান।"

প্রয়াত সিমশন গমেজ
জন্ম : ১০ মে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

প্রাণপ্রিয় বাবা,

আজ তোমার ৮ম মৃত্যুবার্ষিকীতে পরিবারের আমরা সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। সেই সময় বাবা না থাকায়, মা মণির মাঝে বাবাকে হারানোর কষ্টটা ভুলে থাকতাম। কিন্তু মাকে হারিয়ে সে কষ্ট অনেক গুণ বেড়ে গেল।

আগে যতবার প্রতিবেশির বড়দিন সংখ্যায় বাবার মৃত্যুবার্ষিকীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সবই আমার মা-মণির অনুপ্রেরণায়। আজ সেই হাতে আমার মা মণির মৃত্যুর খবর লিখতে হল। এটাই বাস্তব ও নির্মম এবং শাশ্বত এই মৃত্যু সবাইকে মেনে নিতে হয়।

বুকে অনেক কষ্ট নিয়ে বাবাকে হারিয়েছিলাম। সেই থেকে একটু সময়ের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি। বাবা ছিলেন একজন সৎ, সহজ সরল ও ধার্মিক মানুষ। ঈশ্বর সরল মানুষকে বেশি পছন্দ করেন। জগৎ এ ভালো মানুষেরা বেশিদিন বেঁচে থাকে না। কিন্তু তাঁরা তাদের সৎ কর্ম ও ভালো গুণাবলীর জন্য মানুষের অন্তরে স্থান করে নেন।

বাবা প্রার্থনা করি, তুমি স্বর্গদূতদের সঙ্গে পরম পিতার সান্নিধ্যে আছো। আশীর্বাদ করো, আমরা যেন জীবন পথে তোমার নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে পারি। বাবা স্বর্গে, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে থাকো এই প্রার্থনা করি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে-
তোমারই আদরের সন্তানেরা
গাঙ্গুলি বাড়ি, বালিডিয়র, গোল্লা মিশন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

MERRY CHRISTMAS
& Happy New Year 2021

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মা মণির স্বর্গে ৬ মাস

মা-গো চির অম্লান তুমি
মায়ের মত আপন কেহ নাইরে
মা জননী নাইরে যাহার...

প্রয়াত ভেরোনিকা প্রমিলা গমেজ
জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

এমন দরদি ভবে আর হবে না আমার মা-গো

মা-গো, ভাবতেই কষ্ট হয় তুমি আর আমাদের মাঝে নেই। এইতো সেদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে। সময়ের স্রোতে কিভাবে ৬টি মাস অতিক্রান্ত চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। তোমার আদর ও স্নেহ মাখা হাতখানি এবং ভালবাসা ও হাসিতে ভরা মুখখানি দিয়ে আমাদের আগলে রেখেছিলে।

মা ডাকটি শুনতে বড় মধুর কিন্তু কাকে আর মা বলে ডাকবো আমার মা-মণি আর ইহজগতে নেই। মা-গো সামনে শুভ বড়দিনে তোমার কথা মনে পড়বে আর চোখের জলে ভিজবে দু-নয়ন।

মা-গো তুমি যেদিন, আমাদেরকে আদর করে বুঁকে তুলে নিয়ে, নতুন জীবন দান করেছিলে, সেদিন তোমাকে কাছে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। তোমার সারা জীবনের এই ঋণ ও ত্যাগস্বীকার আমরা কোনদিন কোন কিছুর বিনিময়ে শোধ করতে পারব না। তোমার কাছে আমারা চির কৃতজ্ঞ মা। মা-গো কর্মস্থলে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তুমি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে Reward হিসাবে স্বর্ণপদক পেয়েছিলে। মা-গো আমরা বিশ্বাস করি, করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গরাজ্যে তাঁর পাশে স্থান দিয়েছেন। আমরা যেন তোমার মত সততা, ধার্মিকতা ও সরলতার সাথে জীবন-যাপন করতে পারি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদেরকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। আমরা তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন পরম পিতা তোমাকে স্বর্গে শান্তিতে রাখেন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে-
তোমারই আদরের সন্তানেরা
গাঙ্গুলি বাড়ি, বালিডিয়র, গোল্লা মিশন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

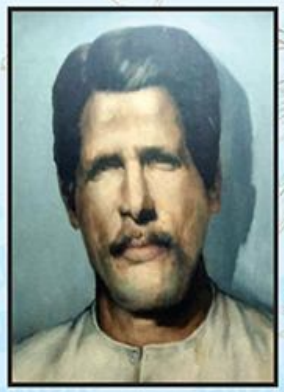

আব্রাহাম ফ্রান্সিস
১৬ অক্টোবর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ
৯ জানুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

চার্লস নিকোলাস ফ্রান্সিস
৩০ এপ্রিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ
২৫ এপ্রিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রিসিল্লা ফ্রান্সিস
২ জানুয়ারী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
৩১ মে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

ইমেল্ডা গমেজ
৯ মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
৪ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী ম্যাডালিন ফ্রান্সিস
(আর এন ডি এম)
২৫ জুন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ
৪ নভেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

রেজিনা রোজারিও
৪ জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার এম ভরথী ফ্রান্সিস
(এম সি)
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
২১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

হেলেন গমেজ
১২ অক্টোবর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
২৩ আগষ্ট ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার চার্লস ফ্রান্সিস
(এম সি)
৮ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
১৯ এপ্রিল ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার শিশিলিয়া ফ্রান্সিস
(আর এন ডি এম)
২৭ জুন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
৭ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

আব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
১ মে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
১০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এরিক ফ্রান্সিস
৪ মার্চ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মহাকালের অতলে তলিয়ে গেছে কত যুগ, কত বর্ষ, কয়েক মাস, কতগুলি দিবস। কিন্তু তোমাদের স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয়নি। তোমাদের খ্যাতি, যশ, মানবীয় গুনাবলী বারবার তোমাদের কাছে নিয়ে যায়। ভুলতে পারিনা। মরমে মরমে বেদনায় হই ভারাক্রান্ত। আমাদের আশীর্বাদ করো তোমরা। তোমাদের জীবনাদর্শ যেন হয় আমাদের চলার পথের পাথেয়। পুন্যময় বড়দিন ও আসন্ন নববর্ষে তোমাদের সাথে নিয়ে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বড়দিন ও নববর্ষ বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ, করোনা মুক্ত হোক গোটাবিশ্ব।

শোকার্ত ফ্রান্সিস পরিবার

তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

জন গমেজ	ইমেল্ডা গমেজ	সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা সিএসসি	পলিন গমেজ	রবিন প্যাট্রিক গমেজ
২৬ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ	৯ মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ ৪ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ	২৭ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ	৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ ১০ মে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ	৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছ অনন্তলোকে। আমরা আজও ভুলিনি তোমাদের ভুলবনা কোনদিন।
যতদিন এ পৃথিবীতে থাকব তোমরাই আমাদের দিক নির্দেশনা দিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।
পরম পিতার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তোমরা যেন থাক তাঁর স্নেহাশ্রয়ে।

বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশে বিদেশে অবস্থানরত সবাইকে জানাই আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

তোমাদের স্নেহধন্য

ডঃ লরেন্স গমেজ, সুজান গমেজ, এন্ড্রু, এলিয়ান্না, এমিলি

সারা ব্র্যাডন, অঞ্জলি এরিক
জ্যাক, জেমস, ক্যারোলাইন, এলেনা, আরিয়া

চির বিদায়ের প্রথম বার্ষিকী

কালের পরিক্রমার যাত্রী হয়ে তুমি চলে গেছ পিতার সদনে। এখন তুমি কেবলি ছবি, হৃদয় মাঝে বসত কর। আঃ হাঃ কি করুণ ও মর্ম গাথা, মর্ম ব্যথা করিলে স্মরণ বুকে ব্যথা উথলে উঠে, করুণ সুরে বুকের মধ্যে বাজিতে থাকে মর্ম ব্যথা, রোজ মেরী, রোজ মেরী, রোজ মেরী। দেখতে দেখতে একটি বছর চলে গেল, তুমি নাই, তুমি নাই। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ আমরা ও বন্ধু বান্ধবেরা বড়ই শোক ও বেদনা নিয়ে পার করেছি এ জগতে। এখন আমরা আছি, শুধু তুমি নাই। কিযে মর্ম জ্বালা বুঝাবো কি করে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বক্ষণে তোমার কথা মনে পরে আর বুকে জ্বালা করে। এও জানি এক দিন আমাদেরও যেতে হবে এ পৃথিবী ছেড়ে। মিলিত হবো এক দিন প্রভুর সঙ্গে। শুধু তোমার ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা বার বার মনে পড়ে। আশা ও প্রার্থনা করি এ পৃথিবীতে তুমি যে ভাল কাজ করেছ তার পূণ্যগুণে পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তার কাছে স্থান দিয়েছেন।

স্বর্গীয়া রোজমেরী গোমেজ
জন্ম : ২২ আগস্ট ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্বামী	: ফিডেলিচ গোমেজ	নাতী-নাতনী	: রুফাস এঞ্জেলো গোমেজ
বড় ছেলে- ছেলে বউ	: থিয়টনিয়াস লেকাভালিয়ার গোমেজ		এ্যামা জোএ্যান গোমেজ
	মেরী গ্লোরিয়া রোজারিও		অরোরা জেরালডিন গোমেজ
মেয়ে ও মেয়ে জামাই	: মেরী ফ্লোরেন্স গোমেজ (মুক্তা)		এ্যালা জেনিন গোমেজ
	খ্রিস্টফার রোনাল্ড গোমেজ (রকি)		এরেণ অ্যান্টনি গোমেজ
ছোট ছেলে- ছেলে বউ	: জন ম্যাক্সওয়েল গোমেজ		এরিণ অরেলিয়া গোমেজ
	এডবিনা আলেকজান্দ্রিয়া পেনিওটি		

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটা কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজও ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীল নারী। মানুষের মনের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।

আমাদের মা মিসেস পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ৬টি বছর তোমাকে ছাড়া। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়,

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইন্নানুয়েল সি. গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায় পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

MEMORY OF OUR BELOVED PAUL ROZARIO

(August 26, 1934- January 07, 2013)

It's been 7 years a great person, **Paul Rozario,** made his journey to the Heavenly Father. Every breath we take feeling his presence among us.

Paul Rozario's teaching and ways of life will pass on from generation to generation. In this Christmas season, We tribute to our beloved grandfather, father and husband.

With Love:

Wife: Teresa Rozario
Sons: Dominic Rozario (শিল্পী)
Aloysius Rozario (শিমুল)
Clement Rozario (সমর)
Daughter's-in-Law: Jacqueline Tripti Rozario
Scolastica Mousumi Rozario
Grand Children: Alexander Rozario
Jane Rozario
Victor C. Rozario (শাওন)
Cornelius A. Rozario (শুভ)
Samantha Angelina Rozario

আসন্ন বড়দিন ও খ্রিস্টিয় নববর্ষ উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" সর্বজনীন ভালবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমতাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে মিলনসমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশের মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের- যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলোঃ মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকারের মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

বছর ঘুরে এলো বড়দিন, আমাদের শিশু যিশুর জন্মদিন!

এই দিনে দেশে বিদেশে সকলকে আমাদের রোজারিও পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই

বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

বাবা: জ্যাষ্টিন রোজারিও
বড় ছেলে: সেবাষ্টিন পংকজ রোজারিও
ছোট ছেলে: সাইরেস মনু রোজারিও
নাতি: জ্যাষ্টিন ডেভেন রোজারিও

মা: ডরথী রোজারিও
বড় মেয়ে: ক্যাথরিন উষা রোজারিও
মেজ মেয়ে: মারীয়া লতা রোজারিও
ছোট মেয়ে: জেনেট রোজারিও
নাতনী: খ্রিষ্টিন সুজানা রোজারিও

কস্তার বাড়ী
মোলাশিকান্দা, হাসনাবাদ মিশন
Present Address: 98-23, Horack Haring Expway # 17 D
Corona NY 11368.

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

স্বর্গধামে প্রথম বছর

ইউজিন রোজারিও (রেজিন মাতবর)
জন্ম: ১৭ নভেম্বর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম ও মিশন: দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু
ধন্য তোমার নাম
তোমার পৃথিবী, তোমারই স্বর্গ
পুণ্য সকল ধাম

প্রিয় বাবা,

দেখতে-দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল, আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোন দিন। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করেছ। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা তোমার সততা, ধার্মিকতা ও সরলতার পথ মেনে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব। তুমি আজও বেঁচে আছ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার আদর্শে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে,

স্ত্রী: লিলিয়ান গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ: অমল-মিনতি, কমল-পুষ্প, নির্মল-করুনা, শ্যামল-রুপালী, ব্রাদার পরিমল(এম.সি), সুবল-সঙ্গীতা(মৃত), মোবেন-কল্যাণী, শিপন-মুনমুন
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: সন্ধ্যা-খোকা, লিপি-সুরেশ
এবং আদরের নাতি-নাতনীরা, নাতি বউরা, নাতনী জামাই, পুতি-পুতিন ও আত্মীয়স্বজন।

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"
তুমি চিরতরে দূরে চলে গেছ
ভুলতে পারবোনা কোনদিন তোমাকে

প্রয়াত ডমিনিক মানুয়েল গমেজ
জন্ম: ৫ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: কাশিনগর, প্রামাণিক বাড়ী
গোল্লা মিশন

অনন্তধামে-জন্ম মৃত্যু দু'টোই প্রবেশদ্বার
যেতে নাহি দিবো হায়
তবুও চলে যায়

সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া সংসারের সকল কর্তব্য পালনের শেষে তোমার চলে যাওয়া চিরকালের মত শেষ করেছো। এখন আছ পরম পিতার করুণাময় আবাসে। তোমার অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে কাঁদায় আমাদের। স্বর্গ থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সকলে তোমার রেখে যাওয়া বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিনের পথ চলতে পারি।

অনন্তকাল পরম শান্তিতে থাকো পিতার কাছে এবং তাঁর আদর্শে বেঁচে থেকো আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার হৃদয়-মন্দিরে, এই প্রার্থনায় স্মরণে রাখি আমরা সকলে।

ইতি
তোমারই স্নেহধন্যা,
মেরী সন্ধ্যা গমেজ
তোমার স্নেহের ছেলে ও বৌমাগণ
মেয়ে ও জামাই, নাতি ও নাতনীগণ
মাতৃছায়া
২৯৪ নং, কাঠাল বাগান

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বিশ্বাস মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

প্রবাসে আন্তনী বিমল গমেজের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুবরণ

আন্তনী বিমল গমেজ

জন্ম: ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণের লয়ে
বসুন্ধরা ছুটেছে আকাশে
হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে,
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগত মৃত্যুর জগত
রবি ঠাকুর

মরণব্যাধি Multiple Myeloma রোগে আক্রান্ত হয়ে বিগত ১মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আন্তনী বিমল গমেজ, ৭৪ নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ Sloan Kettering Cancer Hospital মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন নবাবগঞ্জের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ইক্রাশী গ্রামের ডাক্তার বাড়ীর এক কৃতি সন্তান। দুই ভাই ও এক বোনের মাঝে তিনি ছিলেন স্বর্গীয় ফিলিপ ও ম্যাগডেলিন গমেজের দ্বিতীয় সন্তান। সুদীর্ঘ আটটি বছর প্রাণঘাতী ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

জীবনের সকল উচ্ছ্বাস স্বপ্নেভরা দিনগুলো তার দ্রুত ফুরিয়ে গেছে। আজ তিনি মহাকালের যাত্রী। এই পৃথিবীতে মানুষের আয়ুষ্কাল সীমিত। পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী। আমাদের পারিবারিক জীবনের অভ্যন্তরেই মৃত্যু সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে। জীবনে মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যুকে ভয় করে লাভ কি? এই ছিল তার বিশ্বাস। তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বেশ মেধার অধিকারী ছিলেন। পড়াশুনার প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহবোধ। অধিক রাত জেগে বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠ করতেন। বাড়ীতে রয়েছে অসংখ্য পুস্তকের সংগ্রহ, ইংরেজী কি বাংলা। জীবনে একজন অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিমল গমেজ কিন্তু বিধি বাম! সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বৃত্তি পেয়েছেন বিদ্যালয়ে তিনি, হাতের লেখা ছিল অপূর্ব।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রার্থনাশীল। বাইবেল পাঠ, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পাঠ এবং তা নিয়ে অপরের সাথে আলাপ আলোচনা এবং অপরকে অনুপ্রাণিত করার প্রচেষ্টা ছিল তার স্বাভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি একজন অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারীও ছিলেন।

অবশেষে বলতে চাই। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তিনি তা সুস্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু মোটেই ভীত কিংবা বিচলিত হন নি। মৃত্যুশয্যায় থেকে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে গেছেন। "আমি প্রস্তুত, আমার ভয় নেই।" তার মৃত্যুকালে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী: শিলা গমেজ
মেয়ে: দোলা, স্বামী: রেমজে
দুই নাতী: আরবিন, আমিল, নাতিন: আরিয়া
ছেলে: ডেনিস, স্ত্রী: স্টেফানী
নাতিন: ইডেন ও দুই নাতি: আগষ্টিন ও নোয়া

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বঙ্গ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

সুনীল পেরেরা

ভূমিকা : হাজার বছরের পরিক্রমায় এই প্রাচীন বঙ্গভূমির নাম হয়েছে বাংলাদেশ। এর অধিবাসীরা হলেন বাঙালি। বাঙালির আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার স্ফূরণ ঘটে ইংরেজ উপনিবেশিক আমলে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ হলে এ অঞ্চলে অন্যরকম এক জাতীয়বোধ তৈরি হয়েছিল। এটাই হলো ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেন 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তাদের সতন্দ্র অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত ভাগের আগে বাঙালি মুসলমানগণ তখন সর্বভারতীয় ইসলামী জোশে আচ্ছন্ন। এ সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশনে 'এক পাকিস্তানে'র পক্ষে প্রস্তাব উপস্থাপন করলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ভঙ্গুল হয়ে যায়। বাংলার সবনেতারা তখন পাকিস্তানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত রাজনীতির গন্তব্য অনিবার্য হলো ভারতভাগ। ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তৈরি হলো পাকিস্তান। আধুনিক বিশ্বে ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এটিই প্রথম রাষ্ট্র। দ্বিতীয়টি হলো ইসরায়েল, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে।

সংগ্রামের সূচনা : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একচেটিয়া জয়লাভ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণআন্দোলন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, এর ফলেই বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে।

বাঙালির ঠিকানা খোঁজার লড়াই নতুন মাত্রা পায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর কেন্টিন চত্বরে ছাত্রলীগের এক কর্মীসভায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র আকতার আহমদ শ্লোগান দিয়ে ওঠেন 'জয় বাংলা'। পরে এটিই হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিকী শ্লোগান। যার মধ্যে ফুটে ওঠেছিল একটি জাতিরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভায় দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন 'জয় বাংলা'।

জয়বাংলা থেকে বাংলাদেশ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল কালজয়ী ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধু

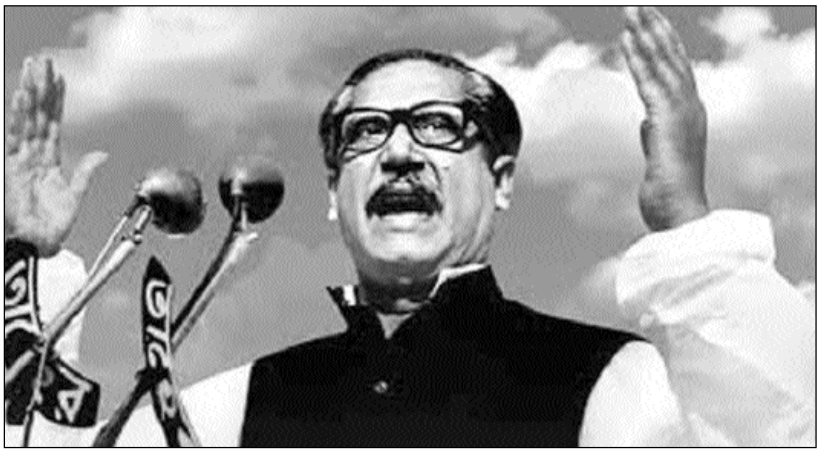

শেখ মুজিবুর রহমানের 'ছয় দফা' ছিল ধ্রুবতারা। ধাপে-ধাপে গড়ে ওঠেছে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতার স্বপ্নসৌধ। পিছিয়ে থাকা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। বাঙালিও মুক্তি চেয়েছিল। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে বাঙালির টান ছিল না। হাজার মাইল দূরের সমাজের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোন বন্ধন ছিল না কখনো। বিশ্বসভ্যতায় ধর্মীয় বন্ধন সবচেয়ে ঠুনকো। এই বন্ধনে বাঙালি বাঁধা পড়েনি।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে একচেটিয়া এবং সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুর জয়লাভ করে। এই নির্বাচন ছিল শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এবং ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি জনগণের চূড়ান্ত ম্যান্ডেট। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপন ও গড়িমসি করায় পূর্ব পাকিস্তান ফুসে ওঠে। একাত্তর সালের ১ মার্চের দুপুর থেকে পাকিস্তান শব্দটি আর এদেশে উচ্চারিত হয়নি। তখন থেকেই এটি বাংলাদেশ।

একাত্তরের মার্চ ছিল অগ্নিগর্ভ। পহেলা মার্চে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেয় স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান। গর্জে ওঠে ঘোষণা দেন স্বৈরা শাসক ইয়াহিয়া খান। গর্জে ওঠে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ। তাকিয়ে আছে তারা তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে। তিনিই তখন দেশের প্রধান নেতা। ইতোমধ্যে, ছাত্রলীগের তরুণ নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, তারা জাতীয় পতাকা আর জাতীর সঙ্গীত নির্ধারণ করে দিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে সোনালী মানচিত্র আঁকা লাল-সবুজ পতাকা। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। সর্বত্রই চলছে হরতাল, মিছিল আর শ্লোগান। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ। আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার অপেক্ষায় বাংলার জনগণ।

মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলি : ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ফোন করে শেখ মুজিবকে বলেন, ২৫ মার্চ বসবে স্থগিত সংসদের অধিবেশন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯ মিনিটের এক

যাদুকরী ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর, রহমান ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতার আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই সময়োচিত ভাষণে বাঙালি জাতিকে তিনি স্বপ্নে বিভোর করেছিলেন। তার দেওয়া স্বাধীনতার ডাক সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকেই মুক্তিকামী জনতা ঘরে-ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল।

মূলত ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। ভাষার, দাবীতে ও আন্দোলন ২৩ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতা দাবীতে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে। তখন থেকে একটি শ্লোগানই সবার মুখে উচ্চারিত হতে থাকে তা হলো, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। এই পর্বে ছিল অনেক রহস্য, নাটকীয়তা, ষড়যন্ত্র আর কুটিলতা। ২৫ দিনের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬০ দিনের মুক্তিযুদ্ধ। লাখ-লাখ মানুষের আত্মত্যাগ আর রক্তপাতের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পরবর্তী স্বাধীনতার বীজমন্ত্র হয়ে ওঠে। এই উত্তাল দিনগুলিতে বঙ্গবন্ধুই দলমত নির্বিশেষে সবার নেতা তিনিই নির্দেশক। তারই বজ্র নিঘোষ ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। অদম্য সাহস আর অকুতোভয় আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে বাঙালি সত্তার গভীর অনুকরণ উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। দেশবাসীকেও তেমনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন সেই সত্তার জাগরণ ঘটাতে। দেশ ও মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকে এক মোহনীয় স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে সেই স্বপন সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীর প্রতি। তিনি যেভাবে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তাতে বিস্মিত হয়েছিল সারা বিশ্ব। এই আন্দোলনের মধ্যেদিয়ে যে ঐক্য, যে শৃঙ্খলা, যে দুর্জয় সংকল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তার তুলনা হয় না। এ ভাষণ যে শুনেছে তারই শরীরে বয়ে গেছে বিদ্যুৎ প্রবাহ। ভাষণে ছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অকথিত বাণীর প্রকাশ, তাদের চেতনার নির্যাস, বক্তব্যের অবিসাংবাদিত আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতার বন্ধনের ফলেই মুক্তিযুদ্ধের জনতা পেয়েছিল প্রেরণা।

এ ভাষণ শুধু রাজনৈতিক দলিল নয়, জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি সম্ভাবনাও তৈরি করেছিল। ভাষণটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অনির্বাণ শিখার মতো। এটি এমন এক অমর কাব্য যার ভূমিকা ও অবদান জাতির জন্য অনুপ্রেরণায় ঋদ্ধ। এটি একটি কালোতীর্ণ শিল্পকর্ম, যা আজও সমানভাবে প্রেরণাদায়ী। ভালোবাসার আবেগে জীবন্ত ও ভাষণটিতে ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন স্বাধীনতার অমর কবি বঙ্গবন্ধু। এই ভাষণ প্রতিটি বাঙালিকে রূপান্তরিত করেছিল বীরের জাতিতে। একটি আহ্বানে পুরো জাতির অন্তরের রুদ্ধ কপাটগুলো খুলে দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়েছিল জাতীয় জীবনের ঘটমান ইতিহাসের মহারণাঙ্গণে। ভাষণটি সর্বস্তরের বাঙালিকে জয়বাংলার সৈনিকে রূপান্তরিত করেছিল এক ধ্যান মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটিকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর বিশ্বপ্রকোণ্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে এ ভাষণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। পৃথিবীর বুকে একজনই বঙ্গবন্ধু, একটাই বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ : আমাদের জাতীয় জীবনে ২৬ মার্চের তাৎপর্য অপরিসীম। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রথম বাক্যতেই কিন্তু বলা হয়েছে, "যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য সত্তরে অবাধ নির্বাচন হয়।" যেহেতু সামরিক জাণ্ডা কথা রাখেনি বরং আলোচনারত অবস্থায় তারা একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে গণহত্যা শুরু করে, তাই সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকার যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। মার্চ মাস বাঙালির অহংকার সংগ্রাম, বিজয় এবং বেদনামিশ্রিত মাস।

শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে হানাদার পাকবাহিনী। প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কত বাড়ি-ঘর পুড়েছে। ধ্বংস হয়েছে শত-শত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ও অসংখ্য স্থাপনা। নির্বিচারে হত্যা করা হয় তিরিশ লাখ মানুষকে। দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর বিনিময় আর কোটি কোটি মানুষের আত্মত্যাগের ফলে ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হয়, বাঙালি ফিরে পায় স্বাধীনতা। তিরানব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাকবাহিনী। ফলে, বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটা সংগ্রামী ইতিহাস, একটা রক্তাক্ত অধ্যায়, একটা কালজয়ী বিপ্লবী চেতনা, একটা জাতীয় সোনালী স্বপ্ন, একটা গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের গল্পগাথা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভাষা আন্দোলনে যার শুরু হযেছিল, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের মধ্যদিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একাত্তরের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দিবসই রক্তের অক্ষরে লেখা। কোন-কোন তারিখ ত্যাগে, আত্মদানে ও গৌরবের মহিমায় সমুজ্জ্বল। এক একটি তারিখ পরিণত হয় সংগ্রামের প্রতীকে, শ্রদ্ধা ও বিজয়ের অবিনাশী স্মারকে। শোক ও বীরত্বগাথার ঋদ্ধ এসব দিনগুলি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে নয়, ভবিষ্যতের পথচলায় নিত্যপ্রেরণা হিসাবেও।

আমাদের বদলে দেওয়ার, বলে যাওয়ার সংগ্রামে পথচলার প্রেরণা যোগাবে একাত্তরের এই দিনগুলি।

মুজিব হত্যা : কী অকৃতজ্ঞ আমরা। যিনি সারাজীবন এক কষ্ট করে, জেল-জুলুম সহ্য করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন, তাকে কত নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হলো। বাঙালি হত্যা করল তার জাতির পিতাকে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। সারাদেশ তখন ঘুমে নিমগ্ন। শুধু জেগে আছে ফারুক-রশিদ গং আর আমেরিকান দূতাবাসের ইউজিন বোস্টার এবং কয়েকজন কর্মকর্তা। আরও রয়েছে দু'জন বাঙালি, মাহবুবুল আলম চাষী আর করিম।

ফারুক কাজ ভাগ করে দিলেন। মুজিবের ৩২ নম্বর বাড়ি আক্রমণ করবে মহিউদ্দিন, হুদা আর নূর। রশিদ নেয় অপারেশনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রধান কাজ এবং গুরুভাই খন্দকার মোস্তাক

আহমদকে ক্ষমতায় বসানো।

মিন্টু রোডে সের নিয়াবাতের বাসা আক্রমণের দায়িত্ব পায় ডালিম। শেখ মনির বাসা আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয় রিসালদার মোসলেমউদ্দিনকে। রেডিও স্টেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং নিউমার্কেট এলাকার দায়িত্বে মেজর শাহরিয়ার। সঙ্গে পিলখানা থেকে বিডিআর আক্রমণ ঠেকাবে। সেনাবাহিনী আক্রমণ করলে যুদ্ধবিমান নিয়ে তৈরি থাকবে লিয়াকত। শেরে বাংলা নগর এবং সভার এলাকা থেকে রক্ষীবাহিনী আক্রমণ করলে তাদের ঠেকাবে ফারুক। তার সঙ্গে থাকবে আটাশটি ট্যাংক।

রাত পৌনে তিনটায় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে আসে সুবেদার মেজর গুয়াহাব জোরদার। রাত ৪:২৫ মিনিটে শুরু হয় বৃষ্টির মতগুলি। একে একে সেরনিয়াবাতের বাসা, শেখ মনির বাসা আক্রমণ করেছে ফারুক-রশিদের ঘাতক বাহিনী।

খবর পেয়ে, বঙ্গবন্ধু পরপর সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল আহম্মদসহ আরও সামরিক কর্মকর্তাকে ফোন করেন। কিন্তু কারও কোন সহায়তা পাবার আগেই সব শেষ।

এভাবেই প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় সপরিবারে এবং আত্মীয়স্বজনসহ সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করল ঘাতকবাহিনী। রশিদের দাম্ভিক উচ্চারণ, "উই হ্যাড কিলড্ শেখ মুজিব। উই হ্যাড টেকেন ওভার দা কন্ট্রোল অব দা গভর্নমেন্ট আণ্ডার দা লিডারশীপ অব খন্দকার মোশতাক আহমদ।"

রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট সকালে রেডিওতে শোনা গেল, "আমি ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারাদেশে মার্শাল ল জারি করা হলো। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। বাংলাদেশ এখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে।"

ইভার তরঙ্গে থেকে আসা গরম শব্দের ঝাঁঝালো বাক্য শুনে চমকে ওঠে বাংলাদেশ। স্তম্ভিত হয় বাংলার মানুষ। দুপুর, পৌনে দুইটায় খন্দকার মোশতাক আহমদ রেডিওতে ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। পাশে থাকলেন তিন বাহিনী প্রধানগণ সফিউল্লাহ, একে খন্দকার এবং এমএইচ খান।

দিল্লীতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধী হতবাক। বাকরুদ্ধ 'র' প্রধান রমেশ্বর নাথ কাউ। তারা বার-বার বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন, "যে কোন সময় অঘটন ঘটতে পারে। সতর্ক থাকুন"। প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তনি বিশ্বাস করেননি কোন বাঙালি তাকে হত্যা করতে পারে।

সেই সকাল থেকেই বঙ্গভবন আর গণভবনে উল্লাস চলছে। কোলাকুলি আর অভিনন্দন জানানোর পালা শেষে মিষ্টিমুখ। জুম্মার নামাজের পর মোশতাক এলেন বঙ্গভবনে। তিন বাহিনীর প্রধানগণও উপস্থিত। শপথ বাক্য পাঠ করার পর নতুন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করলেন। মন্ত্রীরা সবাই আওয়ামীলীগের এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

অন্যদিকে ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। রক্তের গন্ধে মাছিরা ভীড় করেছে। বিকেলেই এক বার্তায় মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানালেন মওলানা ভাসানী। বঙ্গবন্ধু তাকে হুজুর বলে ডাকতেন, আব্বাজানের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

ঢাকার রাস্তার উপর ফারুকের ট্যাংক বাহিনী আর জাসদ গণবাহিনীর সদস্যরা উল্লাস প্রকাশ করছে। প্রথমে বনানী কবরস্থানে অন্যান্যদের লাশ দাফন করা হলো। পরে বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় তার বাড়িতে নিয়ে দাফন করা হয়। এমনি চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়েই পনেরো আগস্টের হত্যাযজ্ঞ নাটকের করুন পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু : এরপর একুশ বছর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাসে বিস্মৃত। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে দিয়ে স্বৈরশাসকেরা তার নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিল ইতিহাসের পাতা থেকে। ওরা বুঝতে পেরেছিল "জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু" অনেক বেশি শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধু ভালোবেসেছিলেন বাঙালি জাতিকে। তাই তিনি রক্ত দিয়ে দেশবাসীর ভালোবাসার ঋণ শোধ করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন চলার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম। জীবনের বেশিরভাগ সময় তাকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। তার সাহস, প্রজ্ঞা, মেধা, সততা, সর্বোপরি, দেশপ্রেমেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশাল প্রতীক এবং নিরন্তর প্রেরণার উৎস। তাই বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে সবচেয়ে সমুজ্জ্বল এবং সর্বোচ্চ স্থানটি বঙ্গবন্ধুর তা স্বীকার করবেন সবাই। এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই।

---- ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত গ্রামবান্ধব স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠন। তাই তিনি প্রতিটি গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তাই 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন"। পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই বঙ্গবন্ধু বিধ্বস্ত দেশ গড়ার, লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লব' শুরু করেছিলেন। 'কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' ছিল সবুজ বিপ্লবের ডাক। তিনি দেশের সেখানেই যেতেন একটি করে বৃক্ষ রোপণ করতেন এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে ও মুজিব বর্ষে আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গীকার হোক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা অর্জন করতে পারব ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ।

শতবর্ষ পার করতে যাওয়া এই মহানায়ক মাত্র অর্ধশত বছরের জীবনে যা কিছু করতে পেরেছিলেন তা আবহমান বাংলার ইতিহাসিক পথ পরিক্রমার এক যুগান্তকারি সোনালী অধ্যায়। ক্ষণজন্মা এই মহানায়কের নির্দেশিত পথ ধরেই বাঙালি এগিয়ে যাবে উদ্দীপ্ত চেতনা আর জোরালো কর্মযোগে।

মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু। তার মৃত্যু নেই, তিনি তার কৃতকর্মের ফলেই বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়-মনে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনি এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ নেতা খুব বেশি নেই। এই ধরণীর মহামানবদের তিনি একজন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির আত্মার মানুষ। বাঙালি তাকে আস্থা-বিশ্বাস-ভালোবাসা ও নৈকট্যের সাথে মহান নেতা করে নিয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই। তিনিও জন্ম দিয়েছেন বাঙালিকে জাতিসত্ত্বার; দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। বাঙালিকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে হাজার বছরের ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এ কথা সত্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আর বাংলাদেশের জন্ম না হলে ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যেতো বাঙালি জাতি॥

এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এর প্রভাব

ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও

১। প্রারম্ভিক কথা

সময়েরঅগ্রযাত্রায় দেখতে দেখতে এফএবিসি ৫০টি বছর অতিক্রম করেছে। ঐতিহাসিক এই মূহুর্তটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এফএবিসি পরিবার ঘটা করে মহাসমারোহে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা এবং ব্যাপক প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এই উৎসব উদ্‌যাপনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই পরিকল্পনা স্থগিত করে তা পরবর্তীতে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতীতের দিকে তাকিয়ে, বর্তমান বাস্তবতা উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর জন্য দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা এবং নবায়িত হওয়াই এই সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মূখ্য উদ্দেশ্য। বিগত ৫০টি বছরে এফএবিসি এর মধ্যদিয়ে এশীয়ার মণ্ডলীগুলোর ওপর বর্ষিত হয়েছে ঈশ্বরের শত সহস্র করুণা ও আশীর্বাদ। এশিয়ার মণ্ডলী হিসাবে একত্রে চলার পথে বিশপগণের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব নিসন্দেহে এক অমূল্য সম্পদ। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার চিন্তা, চেতনা, প্রেরণা ও দিকনির্দেশনার আলোকে স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে উঠা এবং এশিয়াতে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ বিস্তারে এফএবিসি অনেক কাজ করেছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, এতসব কিছুর পরেও হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া এশিয়ার তথা বিশ্বের জনগণ এফএবিসি ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে খুব কমই জানতে পেরেছে। একই কথা সত্য বাংলাদেশ মণ্ডলী তথা জনগণের ক্ষেত্রেও। তাই এই লেখার মধ্য দিয়ে এফএবিসি সম্পর্কে কিছু কথা তথা বাংলাদেশ মণ্ডলীর ওপর এফএবিসি এর প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

২। এফএবিসি এর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি

প্রশ্ন জাগে মনে, "কি এই এফএবিসি"? এফএবিসি হলো এশিয়ার বিশপদের সম্মিলনীগুলোর একটি ফেডারেশন বা সংঘ। ইংরেজীতে বলা হয় "Federation of Asian Bishops' Conferences" (FABC)। যদি এই ফেডারেশনের উৎপত্তির গোড়ার কথা বলতে হয় তাহলে বলা যায় এফএবিসি এর উৎপত্তির বীজ প্রকৃতপক্ষে বপন করা হয়েছিল দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা চলাকালীন সময়ে। দীর্ঘ সময় একসাথে থাকার সময়ে এশিয়ার বিশপগণের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়, বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেই সময়ে তাঁরা এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর জন্য এমন একটি স্থায়ী কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন যেখানে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। এই চিন্তা থেকেই এফএবিসি গঠনের স্বপ্ন জেগে ওঠে। এই স্বপ্নের বীজ বপনের প্রস্তুতির বেশ কয়েক বছর পর সত্যিই আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটি।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পোপ ৬ষ্ঠ পৌল ফিলিপাইনের ম্যানিলা শহরে এসেছিলেন পালকীয় সফরে। পোপ মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ১৮০ জন বিশপ উপস্থিত হয়েছিলেন। এত সংখ্যক বিশপের একত্রে আসা এটাই প্রথম। পোপ মহোদয়ের উপস্থিতি ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ার বিশপগণের অন্তরে লালিত ফেডারেশন গঠনের স্বপ্নটি আরও দৃঢ় হয় এবং এফএবিসি এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। এশিয়ার বিশপগণের এই সমাবেশকে পোপ ৬ষ্ট পৌল "রহস্যেপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত" হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

এখানেই এফএবিসি এর গোড়াপত্তন হয়। সর্বজনীন প্রশ্ন/বিষয় ও সমস্যা নিয়ে একত্রে আলাপ-আলোচনা করা ও তা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা। দীর্ঘ আলোচনার পর এই সমাবেশে গৃহিত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীগুলোর জন্য একটি স্থায়ী কাঠামো তৈয়ারী সিদ্ধান্ত করা হবে। সেই সাথে এটাও নিশ্চেত করা হয় যে, এই কাঠামো তৈয়ারী হলেও তা কোন জাতীয় বিশপ সম্মিলনীর স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার উপর কোন হস্তক্ষেপ করবে না। বিশপদের এই সিদ্ধান্তে পোপ মহোদয়েরও সম্মতি ছিল। তথাপি এই স্থায়ী কাঠামো তৈয়ারী করতে হলে অনুমোদন লাভের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হবে।

উক্ত সমাবেশে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশপ সম্মিলনীরগুলোর সভাপতি বা বিশপ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। এই কেন্দ্রীয় কমিটি একটি স্টেনডিং কমিটি গঠন করবে। স্টেনডিং কমিটি দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার তিনজন বিশপ প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। এই বিশপগণ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য না হয়ে থাকলে পদমর্যাদাবলে তারা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবে। তাদের কাজ হবে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটকে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দেওয়া। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট হলো একটি সেবামূলক মাধ্যম। তাই বিশপ সম্মিলনীর উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা এই